নিজে পড়ি

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

৫

কিছু কথা

শিক্ষার্থীরা যাতে ক্রমশ ভাষাচর্চার মাধ্যমে ভাব-বিনিময়ের অনুশীলন করতে পারে, সেদিকে সযত্ন লক্ষ্য রেখে পঞ্চম পাঠমালায় বিবিধবিষয়ের সন্নিবেশ করা হয়েছে। সঙ্গে দেওয়া হয়েছে লেখক-লেখিকাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখারও পরিচয়।

শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে বাংলা ভাষা ব্যবহারে বেশ সক্ষম হয়েছে, এই ভাষা এখন অনেকটা তাদের দখলে এসেছে। এবার তারা শিখবে বাংলা ভাষার মাধ্যমে চিন্তা করতে এবং ভাবধারা প্রকাশ করতে। সেই উদ্দেশ্যেই অনেকগুলি ভাবমূলক কবিতাও সংকলিত হল, যাতে ছোটবেলা থেকেই কবিতার ভাবঘন ভাষার গভীরতা উপলব্ধির চর্চা করতে শেখে শিক্ষার্থীরা। কবিতাগুলি পাঠ করলে তাদের মনে যে স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি জাগে, তা বিনা দ্বিধায় ভাষায় প্রকাশ করবার উৎসাহ জাগাতে হবে।

গদ্যাংশগুলি পাঠ করার পরে শিক্ষার্থীরা কতখানি বিষয়বস্তু উপলব্ধি করেছে তা যাচাই করতে হবে অনুশীলনীর মাধ্যমে। যথেষ্ট পরিমাণে নমুনা অনুশীলনী প্রত্যেকটি গদ্য ও কবিতার শেষে দেওয়া হয়েছে; যাঁরা পড়বেন, তাঁরা আরও অনুশীলনী-প্রশ্ন গড়ে নিতে পারবেন।

পাঠক্রমে নির্ধারিত ব্যাকরণের কিছু আনুষঙ্গিক অনুশীলনীও বিষয়-বস্তুর সামিল করা হয়েছে। এমনি আরও অনুশীলনী থাকছে 'নিজে লিখি নিজে পড়ি' পঞ্চম অনুশীলনী গ্রন্থটিতে—যেটি এই পাঠমালা-টির পরিপূরক ও সহায়ক পুস্তিকা।

এই পাঠমালার সবশেষে রইল একটি নাটিকা—যেটি শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষের মধ্যেই অভিনয় করে আনন্দ পাবে, আবার পরে বিদ্যা-লয়ের কোনও উৎসবে রূপদান করতেও পারবে।

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজে পড়ি

৫

পঞ্চম পাঠ

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরিয়েন্ট লংম্যান

রেজিস্টার্ড অফিস
৩-৬-২৭২ হিমায়াৎ নগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯

অন্যান্য অফিস
কামানি মার্গ, ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই ৪০০ ০৩৮
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০ ০৭২
১৬০ আন্না সালাই, মাদ্রাজ ৬০০ ০০২
১/২৪ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০ ০০২
৮০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০১
৩-৬-২৭২ হিমায়াৎ নগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯
বিরলা মন্দির রোড, পাটনা ৮০০ ০০৪
এস্. সি. গোস্বামী রোড, পানবাজার, গুয়াহাটি ৭৮১ ০০১
'পাতিয়ালা হাউস', ১৬এ অশোক মার্গ, লক্ষ্নৌ ২২৬ ০০১

ISBN 0 86131 717 3

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৬
চতুর্থ প্রকাশ ঃ ১৯৮৮

চিত্রশিল্পী ঃ
দেবাশিস দেব

প্রকাশক ঃ
ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ৭০০ ০৭২

মুদ্রাকর ঃ
প্রিণ্টো ক্র্যাফট (প্রা.) লিমিটেড
৯৩ দক্ষিণদারি রোড
কলিকাতা ৭০০ ০৪৮

সূচীপত্র

আমার ছেলেবেলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১-১৯৪১) : জন্ম—জোড়াসাঁকো, কলকাতা। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি রূপে পরিচিত। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষায় তাঁর কবিতা পড়া হয়। তিনি দু'হাজারেরও বেশি গান লিখেছেন। তিনি ছিলেন কবি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ্, সুরকার, নাট্যকার এবং স্বদেশপ্রেমিক। ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত দু'টি তাঁরই রচনা। সুন্দর কবিতার বই 'গীতাঞ্জলি' লিখে তিনি 'নোবেল পুরস্কার' পেয়েছিলেন।

দেউড়িতে বাজল সাতটা। নীলকমল মাস্টারের ঘড়ি-ধরা সময় ছিল নিরেট; এক মিনিটের তফাত হবার জো ছিল না। খট্‌খটে রোগা শরীর, কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর ছাত্রেরই মতো, এক দিনের জন্যেও মাথা-ধরার সুযোগ ঘটল না। বই নিয়ে, স্লেট নিয়ে, যেতুম টেবিলের সামনে। কালো বোর্ডের উপর খড়ি দিয়ে অঙ্কের দাগ পড়তে থাকত, সবই বাংলায় — পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত। সাহিত্যে 'সীতার বনবাস' থেকে একদম চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল মেঘনাদবধ কাব্যে। সঙ্গে ছিল 'প্রাকৃত বিজ্ঞান'।

মাঝে মাঝে আসতেন সীতানাথ দত্ত, বিজ্ঞানের ভাসা-ভাসা খবর পাওয়া যেত জানা জিনিস পরখ করে। মাঝে একবার এলেন হেরম্ব তত্ত্বরত্ন। লাগলুম কিছু না বুঝে 'মুগ্ধবোধ' মুখস্থ করে ফেলতে। এমনি করে সারা সকাল জুড়ে নানা রকম পড়ার যতই চাপ পড়ে মন ততই ভিতরে ভিতরে চুরি করে কিছু কিছু বোঝা সরাতে থাকে; জালের মধ্যে ফাঁক করে তার ভিতর দিয়ে মুখস্থ বিদ্যে ফস্‌কিয়ে যেতে চায়; আর নীলকমল মাস্টার তাঁর ছাত্রের বুদ্ধি নিয়ে যে মত জারি করতে থাকেন তা বাইরের পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনাবার মতো হয় না।

বারান্দার আর-এক ধারে বুড়ো দর্জি, চোখে আতশ কাঁচের চশমা, ঝুঁকে পড়ে কাপড় সেলাই করছে, মাঝে মাঝে সময় হলে নমাজ পড়ে নিচ্ছে— চেয়ে দেখি আর ভাবি, কী সুখেই আছে নেয়ামৎ। অঙ্ক



কষতে মাথা যখন ঘুলিয়ে যায়, চোখের উপর শ্লেট আড়াল করে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি, দেউড়ির সামনে চন্দ্রভান লম্বা দাড়ি কাঠের কাঁকই দিয়ে আঁচড়িয়ে তুলছে দুই কানের উপর দুই ভাগে। পাশে বসে আছে কাঁকন-পরা ছিপ্‌ছিপে ছোকরা দরোয়ান, কুটছে তামাক। ঐখানে ঘোড়াটা সকালেই খেয়ে গেছে বালতিতে বরাদ্দ দানা, কাকগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে ঠোকরাচ্ছে ছিটিয়ে-পড়া ছোলা, জনি কুকুরটার কর্তব্যবোধ জেগে ওঠে— ঘেউ ঘেউ করে দেয় তাড়া।

বারান্দায় এক কোণে ঝাঁট দিয়ে জমা করা ধুলোর মধ্যে পুঁতেছিলুম আতার বিচি। কবে তার থেকে কচি পাতা বেরোবে দেখবার জন্যে মন ছট্‌ফট্ করছে। নীলকমল মাস্টার উঠে গেলেই ছুটে গিয়ে তাকে দেখে আসা চাই, আর দেওয়া চাই জল। শেষ পর্যন্ত আমার আশা মেটে নি। যে ঝাঁটা একদিন ধুলো জমিয়েছিল সেই ঝাঁটাই দিয়েছিল ধুলো উড়িয়ে।

সূর্য উপরে উঠে যায়, অর্ধেক আঙিনায় হেলে পড়ে ছায়া। ন'টা বাজে। বেঁটে কালো গোবিন্দ কাঁধে হলদে রঙের ময়লা গামছা ঝুলিয়ে আমাকে নিয়ে যায় স্নান করাতে। সাড়ে ন'টা বাজতেই রোজকার বরাদ্দ ডাল, ভাত, মাছের ঝোলের বাঁধা ভোজ। রুচি হয় না খেতে।

ঘণ্টা বাজে দশটার। বড়ো রাস্তা থেকে মন-উদাস-করা ডাক শোনা যায় কাঁচা-আম-ওয়ালার। বাসনওয়ালা ঠং ঠং আওয়াজ দিয়ে চলছে দূরের থেকে দূরে। গলির ধারের বাড়ির ছাতে বড়োবউ ভিজে চুল শুকোচ্ছে রোদ্দুরে; তার দুই মেয়ে কড়ি নিয়ে খেলেই চলেছে, কোনো তাড়া নেই। মেয়েদের তখন ইস্কুল যাওয়ার তাগিদ ছিল না। মনে হত মেয়ে-জন্মটা নিছক সুখের। বুড়ো ঘোড়া পাল্কি-গাড়িতে করে টেনে নিয়ে চলল আমার দশটা-চারটার আন্দামানে। সাড়ে চারটের পর ফিরে আসি ইস্কুল থেকে। জিম্‌নাস্‌টিকের মাস্টার এসেছেন। কাঠের ডাণ্ডার উপর ঘণ্টাখানেক ধরে শরীরটাকে উলট-পালট করি। তিনি যেতে না যেতে এসে পড়েন ছবি-আঁকার মাস্টার।

ক্রমে দিনের মরচে-পড়া আলো মিলিয়ে আসে। শহরের পাঁচ-মিশালি ঝাপসা শব্দে স্বপ্নের সুর লাগায় ইঁটকাঠের দৈত্যটার দেহে।

পড়বার ঘরে জ্বলে ওঠে তেলের বাতি। অঘোর মাস্টার এসে উপস্থিত। শুরু হয়েছে ইংরেজি পড়া। কালো কালো মলাটের রীডার যেন ওৎ পেতে রয়েছে টেবিলের উপর। মলাটটা ঢলঢলে; পাতাগুলো কিছু ছিঁড়েছে, দাগি; অজায়গায় হাত পাকিয়েছি নিজের নাম ইংরেজিতে লিখে, তার সবটাই ক্যাপিটল অক্ষর। পড়তে পড়তে ঢুলি, ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠি। যত পড়ি তার চেয়ে না পড়ি অনেক বেশি!

বিছানায় ঢুকে এতক্ষণ পরে পাওয়া যায় একটুখানি পোড়ো সময়। সেখানে শুনতে শুনতে শেষ হতে পায় না—

'রাজপুত্তুর চলেছে তেপান্তর মাঠে'...

অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় কোন্ কোন্ বিষয় পড়তেন ? কে কে তাঁকে পড়াতেন ?

২। (ক) রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় তাঁদের বাড়ির বারান্দার আর একপাশে নেয়ামৎ দর্জি কী করত ?

(খ) নিচে দেউড়ির সামনে তিনি কী দৃশ্য দেখতে পেতেন ?

৩। ছেলেবেলায় সারাদিন রবীন্দ্রনাথের কী রুটিন ছিল ?

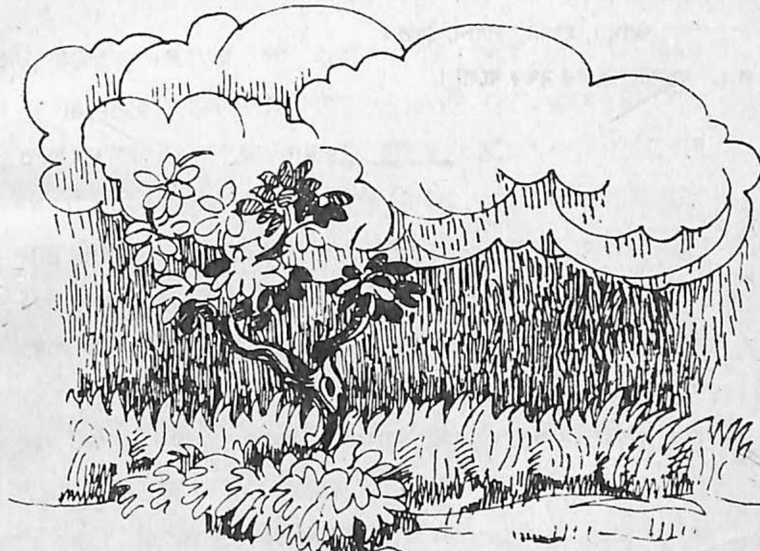
৪। মানে জেনে নিয়ে বাক্য তৈরি করো ঃ

নিরেট, জারি, ফস্‌কানো, নমাজ, আড়াল, কাঁকই, বরাদ্দ, তাগিদ, মরচে-পড়া, পাঁচমিশালি।

যদি বর্ষে আঘনে

(খনার বচন)

আসাম ও পূর্ববঙ্গের মেয়ে-কৃষকদের সম্প্রদায়কে বলা হত 'খনা'। তারা চাষবাস ক'রে যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, সেগুলিকে ছড়ার আকারে মুখে মুখে বলাবলি ক'রে শিখে রাখত।



যদি বর্ষে আঘনে।
রাজা যায় মাগনে॥
যদি বর্ষে পৌষে।
কড়ি হয় তুষে॥
যদি বর্ষে মাঘের শেষ।
ধন্য রাজা পুণ্য দেশ॥

যদি বর্ষে ফাগুনে।
চিনা কাউন দ্বিগুণে ॥
যদি হয় চৈতে বৃষ্টি।
তবে হয় ধানের সৃষ্টি ॥

অনুশীলনী

১। খনার এই বচনটির বক্তব্য নিজের ভাষায় বলো।

২। নিচের কথাগুলোর মার্জিত রূপ কী?

আঘন, মাগন, ফাগুন, চৈত।

৩। বচনটি আদ্যন্ত মুখস্থ বলো।

ভুতো আর ঘোঁতো

সুখলতা রাও

(১৮৮৬-১৯৬৯): বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা। বাংলা ও ইংরেজিতে ছোটদের জন্য প্রায় ২০ খানি বই লিখেছেন। ছোটদের মনের মতো মজার গল্প, কবিতা, ছড়া আর পাঠ্যবই লিখে পুরস্কার পেয়েছেন।

গুটিগুটি চলেছে ঘোঁতো, পা মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে। কখন একটা চিলের নজর পড়ল তার ওপর! চিলটা নেমে এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল তাকে। ভাগ্যে গায়ের কাপড় ধরেছিল, তাই ঘোঁতোর গায়ে নখ লাগেনি। চিল চলছে উড়ে উড়ে। ঘোঁতো চলেছে ঝুলে ঝুলে, আর ভাবছে, — 'যেমনি বসবে চিল, অমনি আমাকে ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে ফেলবে। এই বেলা খসে যাই।'

কিন্তু মাটিতে পড়লে গুঁড়ো হয়ে যাবে, এ ভয়ও আছে। একটা মস্ত গাছের কাছে এসে চিলটা বসতে গেল। ঘোঁতোও আর কিছু না ভেবে, ঝুপ্ ক'রে গলিয়ে পড়ল কাপড়ের ভিতর থেকে। আর, থুপ্ ক'রে পড়ল কী একটা নরম জিনিসের ওপর।

সেই নরম জিনিসটা ছিল ভুতোর গা। গাছের তলায় ভুতো অপেক্ষা করছিল ঘোঁতোর জন্য। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। গায়ে একটা কী পড়তে সে মুঠো ক'রে ধরে নিয়ে জিনিসটাকে চোখের সামনে এনে ধরল। মনে হল, আরশোলার মতো ছোট একটা কী যেন। তাই তো, — মানুষ যে! ভুতো জিজ্ঞেস করল, 'তুই কে রে ?'

তার বিরাট চেহারা দেখে আর গলার স্বর শুনে ঘোঁতোর পিলে চমকে গেছে। সে কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিল, 'আমি ঘোঁতো।'

'তুই ঘোঁতো!' বলে ভুতো চোখ কুঁচকে ভালো ক'রে দেখল।

তারপর হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারল না। বলল, 'এমন দশা কী ক'রে হল তোর?'



'ঝরনার জল খেয়ে।'

তখন সব কথাই পরিষ্কার হয়ে গেল। ভুতো বলল, 'ঝরনার জল খেয়ে আমি হয়েছি দৈত্যের মতো বড়, আর তুই হয়েছিস, অ্যাত্তোটুকু ছোট!'

ঘোঁতো বলল, 'দাদা, তোমার জলটা আমি খেলে কি বড় হয়ে যাব? আমার জলটা তুমি খেলে কি ছোট হয়ে যাবে?'

'কই, তোর জল কই ?' ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল ভুতো।

'পথের ধারে একটা গাছের শিকড়ের নিচে রেখেছি। আমাকে নিয়ে চল, তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব।'

তখন ভুতো ঘোঁতোকে হাতে নিল, ঘোঁতো পথ দেখিয়ে চলল। গাছের নিচে পৌঁছে ঘোঁতো থলি বের করল। ভুতো ট্যাঁক থেকে তার থলি বের করল।

ভুতো একবার বলল, 'যদি জল খেয়ে তোর মতো আরশোলা হয়ে যাই তবে আরো খারাপ। না হয় বড় রইলাম।'

ঘোঁতো বলল, 'আগে তোমার জলটা আমি খেয়ে দেখি। তোমার মতো বড় হয়ে যাই তো দুঃখ নেই। কিন্তু এইরকম ছোট থেকে, বেঁচে লাভ কী ?'

ব'লে সে ভুতোর জল নিয়ে খেল। খেতেই বড় হয়ে, মানুষের মতো শরীর হল তার। ভুতো তখন ঘোঁতোর জলটা ঢক্ ক'রে খেয়ে নিল, আর ছোট হতে হতে, হয়ে গেল আগের মতো মানুষ। তখন দু'জনের ফুর্তি দেখে কে !

অনুশীলনী

১। চিলের হাতে প'ড়ে ঘোঁতোর কী অবস্থা হল ?

২। ভুতো বলল, 'ঝরনার জল খেয়ে আমি হয়েছি দৈত্যের মধ্যে বড়, আর তুই হয়েছিস অ্যাত্তোটুকু ছোট।' — কী ক'রে আবার তারা যে-কে সেই হল ?

৩। বাক্য তৈরি করো :

নজর, ছোঁ, মস্ত, পিলে চমকে, কুঁচকে, ট্যাঁক, ফুর্তি।

৪। জেনে নিয়ে সমার্থক শব্দ লেখো :

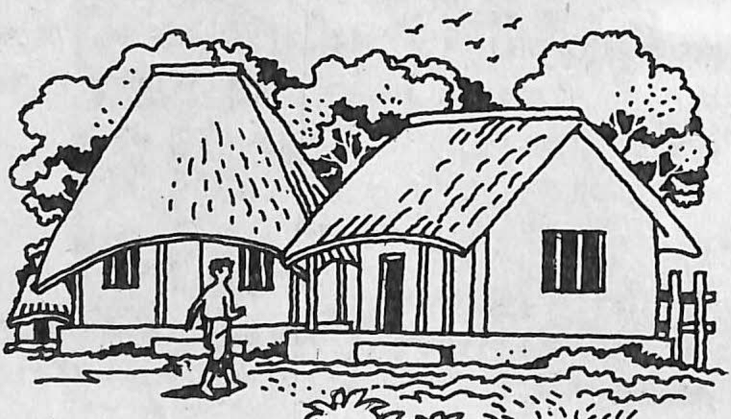
ভাগ্য, ঠোঁট, নরম, গা, দশা।

চাই না মা গো রাজা হতে

রামপ্রসাদ সেন

(১৭২০-১৭৮১): বিখ্যাত সাধক, কবি ও গায়ক। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশংসা পেয়েছিলেন। তাঁর গানগুলিকে 'রামপ্রসাদী গান' বলা হয়।

চাই না মা গো রাজা হতে।
রাজা হবার সাধ নাই মা গো, দু'বেলা যেন পাই মা খেতে।
আমার মাটির ঘরে বাঁশের খুঁটি মা, পাই যেন তায় খড় যোগাতে ॥
আমার মাটির ঘর যে সোনার ঘর মা, ওমা! কি হবে দালানেতে ॥



যদি দালান-কোঠায় রাখো মা গো, পারবো না আর মা বলিতে ॥
যদি দ্বারেতে অতিথি আসে মা, না হয় যেন মুখ লুকাতে।
ঘরে কাঁসার থালা কাঁসার বাটি মা, পাই যেন তায় দুটো খেতে ॥

অনুশীলনী

১। রামপ্রসাদ সেন কে ছিলেন? জেনে নিয়ে দু'চার কথায় লেখো। রামপ্রসাদী গান তুমি কি শুনেছ? তোমার কেমন লাগে?

২। রামপ্রসাদের গানের এই মা কে?

৩। রামপ্রসাদের কেন রাজা হওয়ার সাধ নেই?

৪। নিচের শব্দগুলো দিয়ে আলাদা আলাদা বাক্য বানাও:

সাধ, খুঁটি, যোগাতে, অতিথি।

হজরত ঈসার কথা

এস্ ওয়াজেদ আলী

(১৮৯০-১৯৫৬): জন্ম—তাজপুর, হুগলী। পেশায় ছিলেন ব্যারিস্টার। 'মানুষের দরবার' তাঁর লেখা বিখ্যাত বই।

মহামানব হজরত ঈসা একবার এক এহুদির সঙ্গে পথ অতিক্রম করছিলেন। হজরত ঈসার কাছে তিনটি রুটি ছিল। সেগুলি এহুদিকে দিয়ে তিনি বললেন, 'সাবধানে রেখো, পরে এগুলো কাজে আসবে।' পথ চলতে চলতে একটা রুটি এহুদি লুকিয়ে খেয়ে ফেলল।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে হজরত ঈসা এহুদিকে রুটিগুলি বার করতে বললেন। এহুদি দুটি রুটি বের করল।

হজরত ঈসা বললেন, 'আর একটা রুটি কি হল ?'

এহুদি শপথ ক'রে বলল, 'আপনি আমাকে দুটো রুটি দিয়েছিলেন।'

কিছুদূর অগ্রসর হবার পর এক অন্ধের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হল। হজরত ঈসা অন্ধের জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা করলেন। অন্ধ চক্ষু লাভ করল।

হজরত ঈসা এহুদিকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'যে খোদা আমায় এই অলৌকিক ক্ষমতা দান করেছেন, তাঁর নাম ক'রে জিজ্ঞাসা করছি, তৃতীয় রুটিটির কি হল আমায় তুমি বল।'

এহুদি অম্লানবদনে বলল, 'আমায় আপনি দুটোর বেশি রুটি দেননি।'

চলতে চলতে তাঁরা মানুষের কঙ্কাল দেখতে পেলেন। হজরত ঈসা আশীর্বাদ ক'রে ফুৎকার দিলেন। কঙ্কালটিতে রক্ত, মেদ, মাংস প্রভৃতি এসে দেখা দিতে লাগল। অচিরে দেহটি এক জীবন্ত মানুষে পরিণত হল।

হজরত ঈসা এহুদিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার বল, তৃতীয় রুটিটি কোথায় গেল ?'



এহুদি পূর্বের মতই নির্বিকল্পচিত্তে বলল, 'আমাকে আপনি দুটো রুটিই দিয়েছিলেন।'

চলতে চলতে তাঁরা এক জায়গায় গিয়ে দেখলেন, তিনটি সোনার ইঁট পড়ে আছে। হজরত ঈসা এহুদিকে বললেন, 'এস, এই ইঁট-গুলিকে ভাগ ক'রে নিই। একটা ইঁট আমি নিই, একটা ইঁট তুমি নাও, আর একটা ইঁট তাকে দেওয়া যাক যে সেই রুটিটি ভক্ষণ করেছে।'

ব্যস্তসমস্তভাবে এহুদি বলল, 'হে ঈসা, দুটি ইঁটই আমার প্রাপ্য। আমিই সেই রুটি ভক্ষণ করেছি।'

হজরত ঈসা এহুদিকে ভর্ৎসনা ক'রে, তিনটি সোনার ইঁটই তাকে সমর্পণ ক'রে, তার সঙ্গ ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন।

অনুশীলনী

১। (ক) হজরত ঈসা কার সঙ্গে পথে বেরিয়েছিলেন ?

(খ) তাঁর কাছে ক'টা রুটি ছিল ?

(গ) একটি রুটি কেন কম হল ?

২। (ক) পথে কার কার সঙ্গে ঈসার দেখা হল ?

(খ) তারা কী লাভ করল ?

৩। (ক) সোনার ইঁট তিনটি ঈসা কাকে দিলেন ?

(খ) কেন তিনি এহুদির সঙ্গ ত্যাগ করলেন ?

৪। বানান করো আর মানে বলো :

অতিক্রম, সাক্ষাৎ, সম্বোধন, অলৌকিক, অম্লানবদনে, নির্বিকল্পচিত্তে, ব্যস্তসমস্ত, ভক্ষণ, ভর্ৎসনা, সমর্পণ।

৫। অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বসিয়ে ফাঁকপূরণ করো :

এসে	ক'রে	ঢেকে	গাইতে	নিয়ে	শুনে

(ক) ভিখারী ভিক্ষা ———— আশীর্বাদ করল।

(খ) সকলে তাকে একটা গান ———— বলল।

(গ) তার গান ———— সবাই খুব খুশি হল।

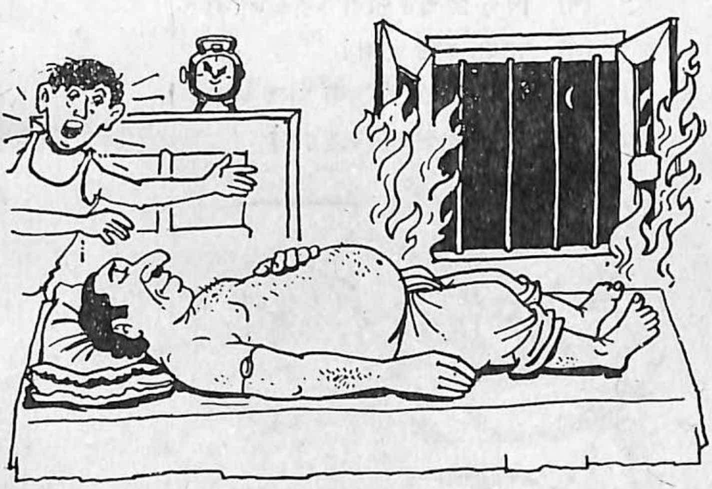
(ঘ) মেঘ ———— আকাশ ———— দিল।

(ঙ) কম জিনিস সকলে ভাগ ———— খায়।

অগ্নিকাণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'তোলপাড়িয়ে উঠল পাড়া
তবু কর্তা দেন না সাড়া—
জাগুন শিগ্‌গির জাগুন !'
'এলারামের ঘড়িটা যে
চুপ রয়েছে, কৈ সে বাজে ?'



'ঘড়ি পরে বাজবে, এখন
ঘরে লাগল আগুন।'
'অসময়ে জাগলে পরে
ভীষণ আমার মাথা ধরে।'

'জান্‌লাটা ঐ উঠল জ্ব'লে—
ঊর্ধ্বশ্বাসে ভাগুন।'

'বড্ড জ্বালায় তিনকড়িটা।'

'জ্বলে যে ছাই হ'ল ভিটা—
ফুটপাথে ঐ বাকি ঘুমটা
শেষ করতে লাগুন।'

অনুশীলনী

১। কবিতায় বর্ণিত কাহিনীটি নিজের কথায় লেখো।

২। (ক) কর্তামশাইকে কি পি-পু-ফি-শু বলা যায় ?

(খ) পি-পু-ফি-শু'র পুরো কথাগুলো কী ?

(গ) ব্যাখ্যা ক'রে বলো।

৩। 'এলারাম' কথাটাতে কী মজা আছে বলো।

৪। কর্তামশাইকে সাবধান করছে কে ?

পরিচয়

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

(১৮৯৯-১৯৭৯) : ছদ্মনাম 'বনফুল'। পেশা ছিল ডাক্তারি। গল্প, নাটক, উপন্যাস, কবিতাও লিখতেন চমৎকার।

'আমাকে চিনতে পারছ ?'

'পারছি বই কি !'

'কি ক'রে পারলে ? চেনবার তো কথা নয় !'

'বাঃ আমি দেখেছি যে ! একবার নয়, অনেকবার।'



'কি ক'রে দেখলে ? আমি তো এখানকার নই। কলকাতা থেকে আমাকে এনেছে এখানে। আমাকে ঠিক নয়, আমার মা'কে। আজই ফুটেছি আমি। তুমি কি কলকাতা গিয়েছিলে কখনও ?'

'না। ওই যে ওই গাছে আমার বাসা।'

টুনটুনি উড়ে গিয়ে তার বাসাটির চারপাশে ঘুরে এল একবার। মালতী ফুল সবিস্ময়ে চেয়ে রইল।

টুনটুনি আবার এসে বসল তার কাছে। বলল, 'তুমি যাই বলো, তোমাকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। মাঝে মাঝে আসব তোমার কাছে। কেমন?'

'এসো —'

ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে চলে গেল সে।

তারপর এলো হাওয়া।

'এই যে, ভালো আছ?'

'আছি। তুমি চেন নাকি আমাকে?'

'বা, চিনি না? চিরকাল তোমাকে দোলাচ্ছি, চিরকাল তোমার সুরভি, তোমার পরাগ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি —'

'কিন্তু আমি তো এখানকার লোক নই —। ভাবছি, কি ক'রে চিনলে?'

'আমিই কি এখানকার লোক নাকি! কাল রেঙুনে ছিলাম, আজ এখানে এসেছি, তার আগে ছিলাম উড়িষ্যায়। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াই আমি। আমরা কারো নই, অথচ সকলের —'

হাওয়া তাকে দুলিয়ে দিয়ে চলে গেল। যে-আলো তাকে ঘিরে ছিল, সে কথা ক'য়ে উঠল।—'তুমি কলকাতার লোক নাকি?'

'আমি কলকাতারও নই, ঢাকারও নই। আমি আকাশের আর তুমি মাটির। আমি আকাশ থেকে নেমে এসেছি মাটিতে তোমাকে ফোটাবো ব'লে। এই পরিচয়ের বাঁধনেই আমরা চিরকাল বাঁধা। আমাদের অন্য পরিচয় নেই।'

আলোর হাসি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

নূতন স্বপ্ন জাগল মালতী ফুলের পাঁপড়িতে। হাওয়া আবার দোল দিয়ে গেল।

টুন্‌টুনি পাখি আবার এসে বসল পাশের ডালটিতে।

অনুশীলনী

১। মালতী ফুলের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে টুনটুনি, তারপর হাওয়া আর আলোর কী কথা হয়েছিল ?

২। নিচে দু'সারি বাক্য দেওয়া হল। দ্বিতীয় সারির একেকটি বাক্যকে বাঁ-সারি বাক্যগুলোর পাশে বন্ধনীর মধ্যে যথাক্রমে সঠিক নম্বর দিয়ে সাজাও :

(১) মালি বলল :	( )	আমি আকাশে উড়ি।
(২) ফুল বলল :	( )	আমি আকাশ থেকে নামি।
(৩) পাখি বলল :	( )	আমি মাটি ফুঁড়ে উঠি।
(৪) হাওয়া বলল :	( )	আমি ঝারি দিয়ে জল দিই।
(৫) আলো বলল :	( )	আমি পাঁপড়ি মেলি।
(৬) গাছ বলল :	( )	আমি চলে ফিরে বেড়াই।

৩। সর্বনাম পদ বসিয়ে ফাঁক পূরণ করো :

(ক) ———— চিনতে পারছ ?

(খ) ———— চেনো নাকি আমাকে ?

(গ) হাওয়া ———— দুলিয়ে দিয়ে চলে গেল।

(ঘ) ———— অন্য পরিচয় নেই।

(ঙ) ———— কলকাতার লোক নাকি ?

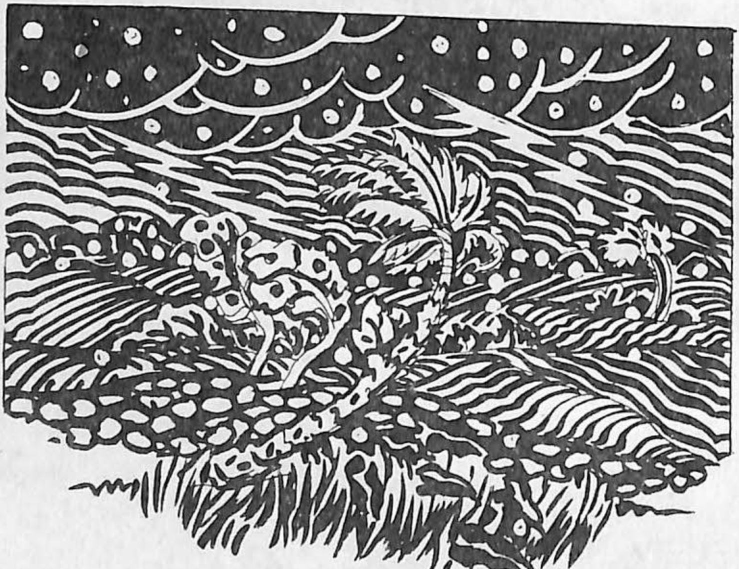
(চ) ———— কলকাতারও নই, ঢাকারও নই।

শিল্

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(১৮৮২-১৯২২): কবিতার মধ্যে রকমারি সহজ সুন্দর ছন্দ তৈরি ক'রে তিনি প্রশংসা পেয়েছিলেন।

ঠিক দুক্কুর বেলা ঘুর্ঘুট্টি !
থই থই মেঘ কালো কুর্কুট্টি !
ইন্দ্রের কোচম্যান্ গলা খাঁক্‌রায়,
ঐরাবতের পিঠে বেত হাঁক্‌রায় !
হুড়মুড় ধায় হাতী আশমানেতে,
শুঁড়ে শুঁড়ে জড়াজড়ি আসতে যেতে !
ঠিক দুক্কুর বেলা ভূতে মারে ঢিল !
চিল কয় ঢিল নয়, শিল্ ! শিল্ ! শিল্ !



কেউ কয়, পারিজাত ফুল ফেলছে !
কার্তিক-গণেশেতে কড়ি খেলছে !
ঝাপটায় দরজায়, আঁটা দায় খিল্ !
ঘরে ঘরে কলরব, শিল্ ! শিল্ ! শিল্ !

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ বলো।

২। শিলাবৃষ্টি দেখে থাকলে তার বর্ণনা দাও।

৩। জেনে নিয়ে মানে লেখো :

ইন্দ্রের কোচম্যান, ঐরাবত, আশমান, পারিজাত, কলরব, দায়।

৪। নিচে মোটা হরফের শব্দের সঙ্গে মিল দিয়ে পূরণ করো :

(ক) লিখেছে যে, **'আশমানে'**।
অভিধানে তার — — ?

(খ) জোরসে বল **হাঁক্ড়ায়**।
পুলিশে চোর —।

15561

মাদ্রাজের মানুষ

সৈয়দ মুজতবা আলী

(১৯০৪-১৯৭৪): নানা দেশ বেড়িয়েছেন, বিদেশে পড়াশুনা ক'রে অনেকগুলি ভাষা জানতেন। ভ্রমণকাহিনী, গল্প এসব সুন্দর লিখতেন।

সমুদ্রের গর্জন আর বাতাসের হাহাকারে যতক্ষণ বারান্দা মুখরিত থাকে, ততক্ষণ রাস্তার কলতলার শব্দ কানে আসে না — শুধু দেখি সমুদ্রপারের জেলেরা আসছে পথের পাশের কলতলায় নাইতে অথবা কাপড় কাচতে; মেয়েরা আসছে জল নিতে, বাসন ধুতে, কাপড় কাচতে, কাচ্চাবাচ্চাদের নাওয়াতে, মাথা ঘষতে। কল থেকে জল বেরোয় অতি মন্দগতিতে — একটি কলসী ভরতে আধ ঘণ্টাটাক লাগে।

বেশি ভিড় না থাকলে দূর গাঁয়ের মেয়েরা শহরে যাবার মুখে মাথা থেকে চুবড়ি নামিয়ে দু'দণ্ড জিরিয়ে নেয়, কলে হাত পা ধোয়।

আপিস কিংবা কারখানা যাওয়ার তাড়া থাকলে নিশ্চয়ই কলতলায় ঝগড়াঝাঁটি বেধে যেত। এখানে সব কিছু ধীরে-সুস্থে এগোয়। ঐ যে জেলেটা আরাম করে কলতলায় গা এলিয়ে দিয়েছে তার জন্য কলসী হাতে মেয়েটার কোনো আপত্তি আছে বলে মনে হচ্ছে না। যে কথাবার্তা হচ্ছে তা সমুদ্রের গর্জনে আর বাতাসের শনশনানিতে শোনা যাচ্ছে না।

আজ বাদলার দিন। নাইবার চাড় নেই বলে কলতলায় ভিড় কম। কাচ্চাবাচ্চারা তো একদম আসেনি। কিন্তু কড়া গরম পড়লে এখানে রীতিমত হাট বসে যায়। কড়া গরম পড়ার মানে যে তখন হাওয়া বন্ধ, কাজেই তখন একটু আধটু চিৎকারও শোনা যায় — মেজাজও তখন কড়া হয়ে যায় বলে।

কলতলার ভিড় কমে আসছে। দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে বারান্দায়

দাঁড়িয়ে দেখি, একটি জেলেনী কলসী ভরে দাঁড়িয়ে রয়েছে — কলতলায় আর কেউ নেই যে কলসীটা মাথায় তুলে দেবে।



এমন সময় এক রিক্সওলা যাচ্ছিল। রিক্স দাঁড় করিয়ে সে কলসীটা তুলে দিয়ে ফের রিক্স টানতে টানতে চলে গেল।

মেয়েটা একবার কৃতজ্ঞ নয়নে তাকালো না পর্যন্ত। রিক্সওলাও অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সাহায্যটুকু ক'রে গেল — যেন এরকম ধারা করাটা তার্ঁ হামেশাই লেগে আছে।

একেই বলে খাঁটি ভদ্রতা।

অনুশীলনী

১। মাদ্রাজে বাদলার দিনে বারান্দা থেকে কী দৃশ্য লেখকের চোখে পড়েছিল ?

২। কোন্ ঘটনায় লেখকের মনে হয়েছিল — 'একেই বলে খাঁটি ভদ্রতা' ?

৩। বাক্য তৈরি করো :

গর্জন, হাহাকার, দু'দণ্ড, ধীরেসুস্থে, মেজাজ, হামেশা।

৪। বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

মুখরিত, মন্দগতি, ঝগড়া, কড়া, বন্ধ, কম, খাঁটি।

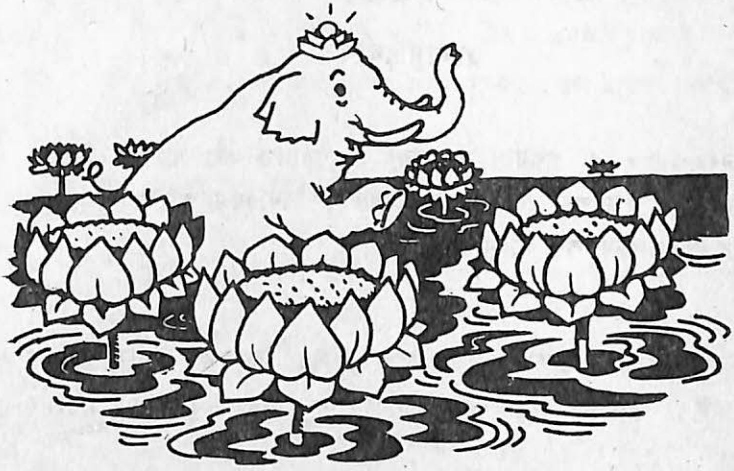
ঠাকুরমার ঝুলি থেকে

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

(১৮৭৭-১৯৫৭): জন্ম—উলাইল, ঢাকা। পিতা রমদারঞ্জন। দশ বছর ধরে পরিক্রমা ক'রে তিনি বাংলার অনেক হারানো ছড়া, গল্প, রূপকথা খুঁজে বা'র করেছিলেন। এই নিয়ে তাঁর অমর রচনা 'ঠাকুরমার ঝুলি' বই। নিচের ছড়া তিনটি তাঁর বইএর তিনটি গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে। 'কাঁকণমালা, কাঞ্চনমালা' গল্পে রাখাল-বন্ধুকে ভুলে যাওয়ার পাপে রাজার দেহময় সূঁচ দেখা দিয়েছিল এবং সেই সূঁচ ছাড়াবার জন্য রাখাল-বন্ধুই নিজে এসে প্রথম ছড়াটি বলেছিল। 'শীত-বসন্ত' গল্পে দুয়োরাণীর ছেলে বসন্ত দুধ-সমুদ্রের ধারে সাদা হাতির মাথা থেকে গজমোতি রত্ন আনতে গিয়ে যা দেখেছিল, দ্বিতীয় ছড়াটিতে আছে তারই বর্ণনা। 'ঘুমন্ত পুরী' গল্পের রাজপুত্র সোনার কাঠি ছুঁইয়ে রাজকন্যাকে জাগিয়ে তুলেছিল, তাই রাজা তাঁর রাজত্ব আর রাজকন্যা সেই রাজপুত্রকে যখন দিয়ে দিলেন, তখন চারিদিকে যে উৎসব শুরু হল, তারই কথা তৃতীয় ছড়াটিতে।

পাই এক হাজার সূঁচ
তবে খাই তরমুজ
সূঁচ পেতাম পাঁচ হাজার
তবে যেতাম হাট বাজার।
যদি পাই লাখ—
তবে দেই রাজ্যপাট॥

ক্ষীর-সাগরে ক্ষীরের ঢেউ ঢল্‌ঢল্ করে
লক্ষ হাজার পদ্মফুল ফুটে আছে থরে।
ঢেউ থই থই সোনার কমল, তারি মাঝে কী?
দুধের বরণ হাতির মাঝে—গজমোতি।



দুয়োরে দুয়োরে মঙ্গল ঘড়া
পাঁচ পল্লব ফুলের তোড়া।
আলপনা বিলিপনা, এয়োর ঝাঁক,
পাঠ-পিড়ী আসন ঘিরে, বেজে ওঠে শাঁখ॥

অনুশীলনী

১। ছড়া তিনটি মন থেকে লেখো।
২। যে-গল্পে এত শুঁচের কথা আছে, 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র সেই গল্পটি বলো।
৩। ক্ষীর-সাগরে কত পদ্মফুল ফুটে আছে?
৪। সাগরের ঢেউ, পদ্মফুল আর হাতির বর্ণনা দাও।
৫। 'দুয়োরে দুয়োরে মঙ্গল ঘড়া' ছড়াটিতে কোন্ উৎসবের বর্ণনা আছে?
৬। চার লাইনের একটি ছড়া নিজে তৈরি ক'রে লেখো।
৭। ছড়াগুলি থেকে দু'টি ক'রে বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া খুঁজে নিয়ে লেখো।

রূপসিংহাসন

সুবোধ ঘোষ

(১৯০৯-১৯৮০): ছদ্মনাম 'কালপুরুষ'। পুরাতত্ত্ব এবং সামরিক বিদ্যা নিয়ে অনেক পড়াশুনা করেছিলেন। জীবনে নানারকম অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে সাহিত্যরচনা শুরু করেন।

সে-দেশের রাজার মেয়ের মনে সুখ নেই। কারণ, রাজার মেয়ের রূপ নেই। রাজার মেয়ে রোজই কাঁদে আর বলে— কেন ? কেন ? কেন ?

রাজার মেয়ের নাম চন্দ্রাবতী। কিন্তু এই নাম যেন একটা নিষ্ঠুর ঠাট্টা।

একদিন চোখের জল না মুছে ঘুমিয়ে পড়েছিল রাজার মেয়ে। স্বপ্ন দেখল, স্বপ্নে শুনতে পেল, বাসন্তী রাতের চাঁদ বলছে— আমি তোমার সারা গায়ে, চোখে আর মুখে রূপের জোছনা মাখিয়ে দিতে চাই। চৈতী শিমুলের ফুল বলছে— আমি তোমার ঠোঁট দুটিকে রাঙা হাসিতে ভরে দিতে চাই।

রাজার মেয়ে আকুল হয়ে বলে— তবে এস, এস, এস। তাই করো।

ওরা বলে— রূপসিংহাসন! রূপসিংহাসন!

রাজার মেয়ে— সে কী ? সে কী ? সে কী ?

— বনের ফুলের পরাগধুলো দিয়ে একটি সিংহাসন এঁকে তার উপর শিশির-ধোওয়া ঘাসফুল ছড়িয়ে দাও। তার উপর রাখবে একটি পদ্মকলি। তারপর মানত করবে। মানত করতে যদি ভুল না হয়, তবে ওই পদ্মকলি ফুটে উঠবে। তোমারও রূপ ফুটে উঠবে।

রাজার মেয়ে — কী মানত করব, বলে দাও।

— মানত করবে সেই মান্যি, চন্দ্রসূর্য যা কখনো পাননি।

স্বপ্নে যেমনটি আদেশ পেল, ঠিক তেমনটি ক'রে বনের ফুলের পরাগধুলো দিয়ে রূপসিংহাসন এঁকে মানত করল রাজার মেয়ে।

সোনার থালায় ভুজ্যন্
সোনার ফুলে পূজ্যন্
মানত করি মান্যি
চন্দ্রসূর্য পাননি
ফোট পদ্মকলি, ফোট !

কিন্তু কই ? পদ্মকলি ফুটে উঠল না !

রাজার মেয়ে কাঁদতে থাকে। রাজা ছুটে এসে বলেন — এই নাও, এই গজমোতির মালা মানত করো। রানী এসে বলেন — এই নাও, হাজার হীরের এই টোপর মানত করো। রাজার মা এসে বলেন — এই নাও, এই শঙ্খমানিক মানত করো।

রাজার মেয়ে আবার মানত ক'রে বলে —

শঙ্খমানিক, মানিক সেরা
গজমোতি, হাজার হীরা
মানত করি মান্যি
চন্দ্রসূর্য পাননি।

কিন্তু পদ্মকলি ফুটে উঠল না। রাজার মেয়ের চোখ জলে ভাসে। রাজপুরীর সব মানুষ এসে ভিড় করে। কী ভয়ানক বিষাদের ভিড় ! কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই ভিড়ের মধ্যে একটি ছোট-ছেলে দাঁড়িয়ে আছে আর হাসছে ! এ ছেলেকে কেউ কখনও দেখেনি।

রাজার মেয়ের হাতের কাছে ছোট্ট একটি ছবি এগিয়ে দিয়ে ছোট-ছেলেটি বলে— এই নাও, এই ছবিকে রূপসিংহাসনের উপর রেখে দাও।



রাজার মেয়ে — এ কিসের ছবি ?

ছোট-ছেলে — এ আমার মন-ছবি।

রাজার মেয়ে আশ্চর্য হয়— সে কী! সে কী! সে কী! কী আছে এই ছবিতে ?

ছোট-ছেলে — সব আছে।

ছোট-ছেলের হাত থেকে ছবিটিকে নিয়ে রাজার মেয়ে যেই না রূপসিংহাসনের উপর রেখে দিল, অমনি ফুটে উঠল পদ্মকলি। অমনি রাজার মেয়ের চোখে মুখে ও সারা গায়ে যেন রূপের জোছনা উথলে উঠল। সবাই হেসে ওঠে আর বলতে থাকে ঃ

রাজার মেয়ে রূপবতী
চন্দ্রাবতী! চন্দ্রাবতী!

সেই থেকে সে-দেশের সব মেয়ে রূপসিংহাসনের ব্রত করে।

অনুশীলনী

১। চন্দ্রাবতী নামটা কেন ছিল 'একটা নিষ্ঠুর ঠাট্টা' ?

২। রূপসিংহাসন ব্রত কিভাবে পালন করতে হয় ?

৩। রূপসিংহাসনের কাছে মানত করার মন্ত্র দুটি বলো।

৪। ছোট ছেলেটির সঙ্গে চন্দ্রাবতীর দেখা হওয়ার কথা আর তার কী ফল হল, নিজের ভাষায় বলো।

৫। পাশের শব্দসমষ্টি থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে ফাঁক ভর্তি করো :

(ক) গাছের শিকড়কে বলে ————।

(খ) ———— ফুলের রংটি লাল।

(গ) চন্দ্রাবতী ছিলেন যেন রাজার চোখের ———।

(ঘ) হাজার হীরের এই ——— মানত করো।

মণি মূল টোপর শিমূল

৩। বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

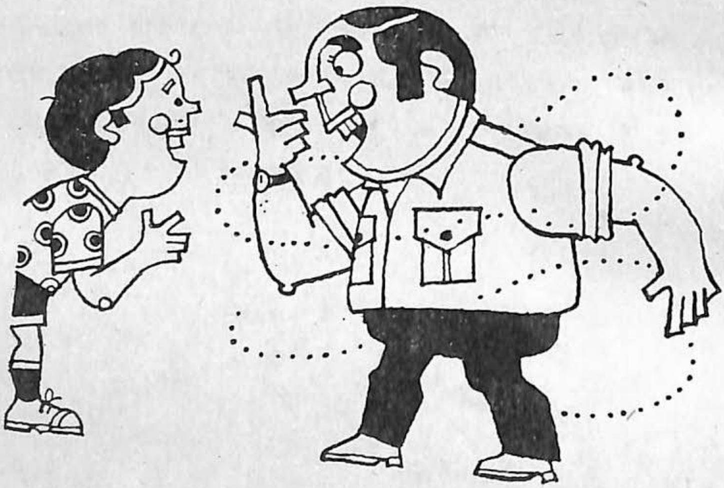
রাজা, কাঁদে, ওপর, মেয়ে, ছোট, ভিড়, এস, কাছে, নেই।

আজগুবি মামা

হাসিরাশি দেবী

(১৯১২-   ): ছোটদের জন্যে অনেক গল্প কবিতা লিখেছেন, ছবিও এঁকেছেন। এঁর বড়দিদি প্রভাবতী দেবী সরস্বতীও লেখিকা ছিলেন।

বাতাস-বাড়ির মামা
সেদিন রাতে
বাড়ির ছাতে
নামলো দিয়ে হামা।
সটান আকাশ থেকে —
বলল ডেকে হেঁকে —
'ভাগ্‌নে শোন, — এলাম তোমার কাছে
একে একে বলবো তোমায়, — অনেক কথা আছে।'



তাই তো শুনে ভড়কে গিয়ে ভুতো
ভয়ে কেঁপে বলল —

‘ও সব ছুতো !
মামার প্রমাণ কোথায় তোমার ?
মাথা ভরাই টাক ছিল যার
পাঞ্জাবি যাঁর থাকত গায়েই—
পরনে পাৎলুন,
তোমার তো কই দেখছি না তার
একটা কোনও গুণ !’

অনুশীলনী

১। প্রথম আট লাইন মুখস্থ বলো।

২। আজগুবি মামা আর ভাগ্‌নেতে কী কথা হল ?

৩। বাক্য তৈরি করো ঃ

ছুতো, প্রমাণ, ভড়কে গিয়ে, টাক, সটান।

রামমোহন রায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(১৯১৯-১৯৭১)ঃ আসল নাম তারকনাথ, ছদ্মনাম 'সুনন্দ'। কলেজে অধ্যাপনা করতেন।

দেহে-মনে অদ্ভুতকর্মা পুরুষ রামমোহন রায়।

অটুট স্বাস্থ্য, অসামান্য কর্মশক্তি। দৈনিক আঠারো-উনিশ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে পারেন। খেতেও পারেন তেমনি। বারো সের ক'রে দুধ আর চার সের ক'রে মাংস খাওয়া তাঁর পক্ষে কিছুই নয় — পঞ্চাশটা ডাব নইলে তেষ্টা মেটে না — চল্লিশটা আম দিয়ে জলযোগ করেন। পুরুষের মতো পুরুষ সন্দেহ কী!

চমৎকার সুন্দর চেহারা। তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি — প্রতিভাপ্রসন্ন ললাট — যেন জনগণমন-অধিনায়ক হওয়ার ক্ষমতা নিয়েই জন্মেছিলেন।

দশ হাতে কাজ ক'রে চলেছেন। ব্রাহ্মসভা, অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল, ডাফ স্কুল, ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে ভারতীয়দের অধিকার আদায় করবার আন্দোলন, দেশের শিল্পনৈতিক উন্নতি — যেদিকে তাকানো যায়, হিমালয়ের চুড়োর মতো রামমোহন দাঁড়িয়ে আছেন মাথা তুলে। দেশের সমস্ত প্রগতিশীল চিন্তাধারার মূর্ত বিগ্রহ রামমোহন। একটি মাত্র মানুষের মধ্যেই সারা ভারতবর্ষ সেদিন যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

এমন অসামান্য ব্যক্তিত্ব, এমন পাণ্ডিত্য আর এতবড় কর্মশক্তি নিয়ে তাঁর পরে আজ পর্যন্ত আর একজন মানুষও জন্মান নি এশিয়ায়। একজনও না।

সাত-আটটা ভাষাই শিখেছিলেন। আর শেখবার কী আগ্রহ!

মিশনারিদের সঙ্গে তর্ক করতে হবে ? বহুত আচ্ছা ! সঙ্গে সঙ্গে মূল বাইবেল পড়বার জন্যে হিব্রু ভাষা তিনি শিখে ফেললেন।

সে-মেধার তুলনা হয় না !

একবার এক বিরাট পণ্ডিত একখানা তন্ত্রের বই নিয়ে রামমোহনের সঙ্গে তর্ক করতে এলেন। তন্ত্রের সে-বইখানা রামমোহনের পড়া ছিল না। তিনি পণ্ডিতকে পরদিন আসতে বলে দিলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে শোভাবাজারের রাজবাড়ি থেকে তন্ত্রের বইটি আনিয়ে নিলেন। এক রাত্রির পরিশ্রমে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করলেন দুরূহ বইখানা।

পরদিন পণ্ডিতের সঙ্গে শুরু হল বিচার। কী হল বিচারে ? দুর্ধর্ষ পণ্ডিত হার মেনে লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পায়ের তলায়।

কত গল্প যে আছে রামমোহন সম্বন্ধে ! দু-একটা বলি।



একবার এক ব্রাহ্মণ নাকি কঠিন রোগমুক্তির জন্যে দেবতার দুয়োরে ধরনা দেন। দেবতার স্বপ্নাদেশ হল : যদি তিনি তাঁদের গ্রামের বুড়ো কলুর ছোঁয়া খান, তবে তাঁর রোগ সারবে।

কলুর ছোঁয়া ! কী সর্বনাশ ! জাত থাকবে না যে ! ব্রাহ্মণ

চোখে অন্ধকার দেখলেন। একদিকে জাত, আর একদিকে প্রাণ। কোন্‌টা রাখেন ?

অগত্যা উপায় চাইতে গেলেন রামমোহনের কাছে।

রামমোহনের এ-সবে বিশ্বাস ছিল না। তবু ব্রাহ্মণের দশা দেখে তাঁর দয়া হল। তিনি বললেন, আপনি কলুকে নিয়ে জগন্নাথধামে চলে যান। সেখানে জাতি বিচার নেই, সবাই সবার ছোঁয়া খেতে পারে।

চমৎকার সমাধান! ব্রাহ্মণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

অনুশীলনী

১। রামমোহন মানুষটি কেমন ছিলেন? ওঁর স্বভাব আর কর্মশক্তি সম্বন্ধে কিছু বলো।

২। ওঁর সম্বন্ধে যে সব কাহিনী আছে, তার একটি নিজের ভাষায় বলো।

৩। মানে বলো :

অদ্ভুতকর্মা, উদ্ভাসিত, মিশনারি, দুরূহ, কলু।

৪। বাক্য তৈরি করো :

অসামান্য, মূর্ত, দুর্ধর্ষ, আয়ত্ত, সমাধান।

শব্দকল্পদ্রুম

সুকুমার রায়

(১৮৮৭-১৯২৩): জন্ম—কলকাতা। ছোটদের জন্য নাটক, ছড়া, গান, গল্প, প্রবন্ধ অক্লান্ত ভাবে লিখে গেছেন।



ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্, শুনে লাগে খট্‌কা, —
ফুল ফোটে ? তাই বল ! আমি ভাবি পট্‌কা !
শাঁই শাঁই পন্ পন্, ভয়ে কান বন্ধ —
ওই বুঝি ছুটে যায় সে ফুলের গন্ধ ?
হুড়মুড় ধুপ্ ধাপ্ — ও কি শুনি ভাই রে !
দেখছ না হিম পড়ে — যেও নাকো বাইরে।
চুপ্ চুপ্ ঐ শোন ! ঝুপ্ ঝাপ্ ঝ-পাস্।
চাঁদ বুঝি ডুবে গেল ?— গব্ গব্ গ-বাস্ !

অনুশীলনী

১। 'শব্দকল্পদ্রুম' কবিতাটার মজা কোথায় ? তুমি কি মজা পাচ্ছ ?

২। হাতে তাল রেখে কবিতাটি যথাযথভাবে আবৃত্তি করতে শেখো।

পাখির গান

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

(১৯১১-১৯৭৭) : জন্ম—শীতলাই, পাবনা। পিতা যোগেন্দ্রনাথ। প্রখ্যাত গায়ক-কবি।

আমাদের বাড়িতে খাঁচায় থাকে ছোট্ট লাল মুনিয়া পাখি চার ইঞ্চি মাপের। রোজ ভোর হলেই সুন্দর মিষ্টি শিস্ দেওয়া শুরু করে। তার মধ্যে একটা ছোট্ট গানের ইঙ্গিত পাই, যেটা বার বার একই সুরে আবৃত্তি করলেও শুনতে খুব ভালো লাগে। তার গানকে আমাদের ভাষায় লিখতে গেলে খানিকটা এইরকম শোনায় :

ট্রিল্লি টুই টুই টুইয়া টিটিক ট্রিল্লী ট্রিলিলিলি লিলিলুক

মূলত একই সুর আবৃত্তি করলেও, মাঝে মাঝে কিছু কিছু শ্রুতিসুখকর রকমফের ঘটে। প্রায় এটাকে একটা ছন্দের ভিতর, তালের ছকে ফেলা যায়। উচ্চস্তরের গায়ক-পক্ষীদের বেলায় কণ্ঠস্বরের আরও অনেক বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য থাকে।

তবে একটা কথা বলা দরকার। সব গাইয়ে-পাখিরাই কিন্তু পুরুষ। স্ত্রী-পক্ষীরা একটু-আধটু ডাকে অবশ্য, তবে অধিকাংশ সময়ে নীরবই থাকে। মুখ্যত গানের উৎস আনন্দ, এবং ঋতু বসন্ত। এই বসন্তেই তারা সঙ্গিনীদের খোঁজে, বাসা বাঁধে। তখন পুরুষ-পাখিরা দিগ্বিজয়ী নায়কের মতো ঘোরাফেরা করে। উপরন্তু ডানা কাঁপিয়ে, বুকের ও মাথার পালকগুলি ফুলিয়ে ভাবী সঙ্গিনীর সামনে গান ও নাচের জলসা হয়।

এক-এক পাখির এক-এক রকম রীতি ও নর্তনভঙ্গী। এই সময়টা পাখিদের নাচ-গান দেখবার মতো হয়। পক্ষী-নির্বিশেষে, বসন্তের মরশুমে এই কলা-প্রদর্শন চূড়ান্তে পৌঁছয়।

বসন্ত ঋতু ছাড়াও পাখিদের অন্য অনেক গাইবার মরশুম আছে।

বর্ষাকালে মেঘ জম্‌লে পেখম খুলে ময়ূরের নৃত্য প্রসিদ্ধ। কিংবা বনে বনে মধুভরা ফুল ফুটলে, ফল পাকলে তারা মধু খেয়ে, রসাল ফল খেয়ে, শস্যকণা কুড়িয়ে গানের ভিতর দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। তবে বিখ্যাত ওস্তাদ গাইয়ে-পাখিরা কীট-পতঙ্গই বেশি পছন্দ করে। যেমন, শ্যামা, দোয়েল, দামা, কস্তূরা ইত্যাদি।



তবে, যে ওস্তাদ গাইয়ে-পাখি আমাদের সব চেয়ে কাছের, বাড়ির পিছনের বাগানে, পার্কে পার্কে, লেকের ধারে, ভাঙাবাড়ির ছাদে, সব জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়, সেই ঘরোয়া ওস্তাদ পাখিটার নাম দোয়েল।

তোমরা দেখেছ হয়ত, আট ইঞ্চি মাপের পাখিটা। কুচকুচে কালো রং। তলপেট সাদা। ডানার দু'পাশে সাদা পালকের রেখা। ল্যাজের দু-পাশটা সাদা, মধ্যিখানে কালো।

রবিনের ভঙ্গীতে ল্যাজটা খাড়া পিঠের ওপর তোলে, আবার নামায়। গাইবার সময় সবচেয়ে উঁচু জায়গা বেছে নেয়—গাছের মগডালে, বাড়ির তেতলার ছাদের চূড়ায়, বা টেলিগ্রাফের খামবার ওপর, এবং সেখান থেকে তার সুরের ঝর্না নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ঝরাতে থাকে। গাইবার সময় তার পাশের দুই ডানা অল্প একটু মেলে দেয়। ডানা

দুটো সুরের আবেগে অল্প-অল্প কাঁপতে থাকে। ল্যাজও মেলে ধরে নিচের দিকে। শরীরের অনুপাতে ল্যাজটি বড় হওয়ায় গাইবার ভঙ্গীটি অপরূপ হয়।

আমাদের বাড়ির পিছনের বাগানে যে ওস্তাদটি সঙ্গীত চর্চা ক'রে থাকেন ভোর বেলা থেকে, তার রাগিণীর একটা-স্বর-চিত্র সম্ভব। যেমন ধর ঃ

টাউ টিউ টিউ-টুইয়া চিক্ চিক্ চিকর
টাউ টিক্ টিক-টিটিক টিটিক টুই।

রোজই সুরের দিক থেকে একটা না একটা কিছু পরিবর্তন ঘটেই। ভাবা যায় না, এতো সুর ও ছন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার কোথায় পায়!

অনুশীলনী

১। লেখাটি প'ড়ে বলো ঃ

(ক) মুনিয়া পাখি কি ভাবে ডাকে ?

(খ) দোয়েলের গানের স্বর-চিত্রটা কেমন ?

২। নিচে থেকে ঠিক ঠিক শব্দ বেছে শূন্যস্থানে বসাও ঃ

চার ইঞ্চি ; পুরুষ ; কুচকুচে কালো ; ময়ূরের

(ক) বর্ষাকালে মেঘ জমলে পেখম খুলে ———— নৃত্য প্রসিদ্ধ।

(খ) ছোট্ট লাল মুনিয়া পাখি ———— মাপের।

(গ) সব গাইয়ে পাখিরাই কিন্তু ————।

(ঘ) দোয়েল পাখির রং ————।

৩। নিচের শব্দগুলি থেকে বেছে নিয়ে সঠিক সমার্থক শব্দ বসাও ঃ

প্রচুর প্রধান বদল ইশারা পাখা পোকামাকড় প্রকারভেদ

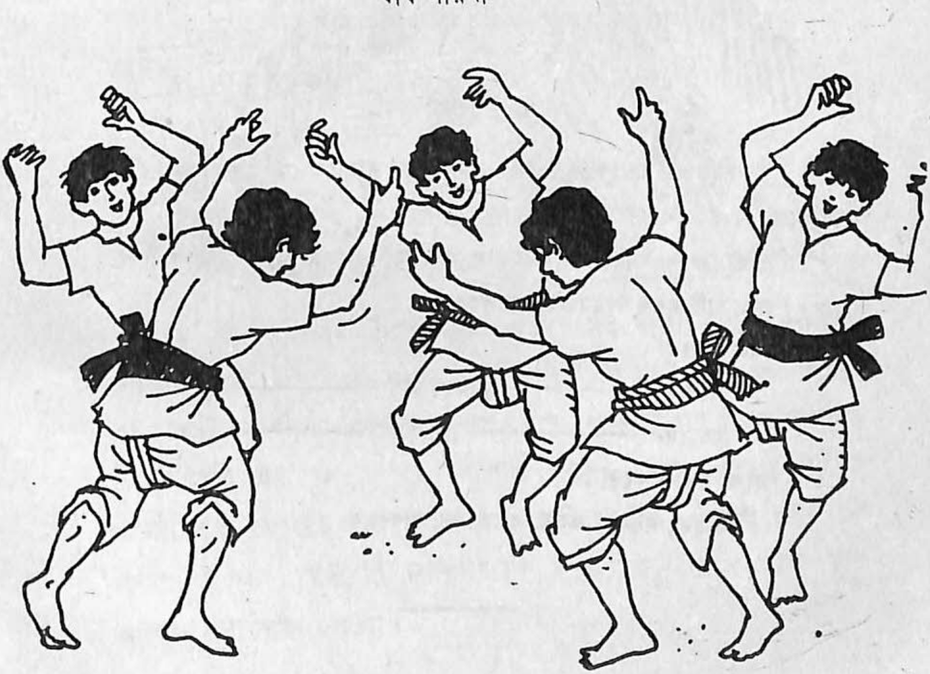
ডানা ; রকমফের ; পরিবর্তন ; মুখ্য ; অনেক ; কীটপতঙ্গ ; ইঙ্গিত।

তরুণ-দল

গুরুসদয় দত্ত

(১৮৮২-১৯৪১): জন্ম—বীরশ্রী, শ্রীহট্ট। পিতা রামকৃষ্ণ দত্তচৌধুরী। আই. সি. এস্ পাশ ক'রে জেলাশাসক হয়েছিলেন। জাতীয় চেতনা জাগানো এবং শরীর গঠনের জন্য লোকরঞ্জক ছড়া ও নৃত্য গীতের মধ্যে দিয়ে ব্রতচারী আন্দোলন গড়ে তোলেন। অনেক বই লিখেছেন। 'তরুণ দল' ব্রতচারীদের একটি নৃত্যালী গীত।

বাংলা মা'র দুর্নিবার আমরা তরুণ-দল;
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন সঙ্কটে অটল!
গঙ্গা-রাঢ় পাল রাজার
বীর্য গরিমা—



চণ্ডীদাস   জয়দেবের
ছন্দ-ভঙ্গিমা—
হোসেন শা'র ঈশা খাঁ'র শক্তি মহিমা—
ঢেউ তাদের দেয় মোদের চিত্তে অবিরল !
নিঃস্বতার   দৈন্য-ভার
করব উৎপাদন ;
অজ্ঞতার   অন্ধকার
করব নির্বাসন ;
নবযুগের উন্মেষের জ্বালব দীপ উজল ।
সংযমের   পৌরুষের
পালব প্রেরণা ;
শ্রম-যোগের   উদ্‌যোগের
সাধব সাধনা
বাংলা-মা'র লাঞ্ছনার মুছব অশ্রুজল ॥

অনুশীলনী

১। গুরুসদয় দত্ত লোকরঞ্জক ছড়া ও সঙ্গীতের সাহায্যে যে আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার নাম এবং উদ্দেশ্য কি জানো ?

২। এঁরা কে —পালরাজা, চণ্ডীদাস, জয়দেব, হোসেন শা, ঈশা খাঁ ?

৩। কবিতাটি মুখস্থ ক'রে আবৃত্তি করো।

৪। মিল দাও :

অটল —————— ; গঙ্গা রাঢ় —————— ;

উৎসাদন —————— ; প্রেরণা —————— ।

৫। বাক্য তৈরি করো :

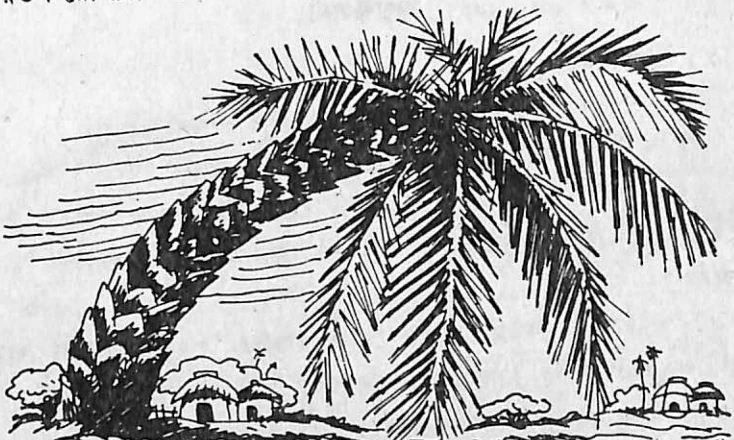
মহিমা, নবযুগ, জ্বলন, বাংলা-মা, সাধনা।

ফরিদপুরের খেজুর গাছ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

(১৯১৯-　　) : জন্ম—কৃষ্ণনগর, নদীয়া। পিতা ক্ষিতীশচন্দ্র। খুব অল্প বয়সেই 'পদাতিক' কবিতার বই ছাপা হয়।

ফরিদপুরে একবার একটা অদ্ভুত ধরনের খেজুর গাছের খবর পাওয়া গেল। সন্ধ্যের সময় গাছটা নুইয়ে পড়ত, পাতাগুলো তার মাটিতে ঠেকত। আবার সকাল হলেই খাড়া হয়ে উঠত। লোকে এটাকে অলৌকিক ব্যাপার ভেবে খেজুর গাছকে ঠাকুর-দেবতা হিসেবে পুজো করত। রোগীরা এসে গাছের পুজোর প্রসাদ খেত রোগ সারাবার জন্যে।



এর আগে যেসব বৈজ্ঞানিক এসে এসব ব্যাপার দেখে গেছেন, গোড়ায় তাঁরা কেউ এর রহস্য ভেদ করতে পারেন নি। জগদীশচন্দ্র এই গাছটি দেখেন। খেজুর গাছের মালিক গাছটির গায়ে কল লাগাতে দিতে রাজী হয় নি, পাছে বিলিতি কলের ছোঁয়া লেগে গাছের অলৌকিকত্ব নষ্ট হয়ে তার অর্থাগমের পথটি বন্ধ হয়। কিন্তু যখন সে শুনল এ কল এদেশের কারিগররাই বানিয়েছে, তখন আর তার আপত্তি করা সম্ভব হল না।

জগদীশচন্দ্র দেখলেন, খেজুর গাছটা মাটি থেকে একেবারে সোজা হয়ে ওঠেনি। শিশু অবস্থায় গাছটা ঝড়ে কাত হয়ে যায়, তাই খানিকটা হেলে গিয়ে তারপর হঠাৎ এক জায়গায় মোচড় খেয়ে সোজা হয়ে উঠেছে। যে জায়গাটা বেঁকে গেছে, সেখানে ওপর দিকে ক্রমাগত রোদ-ঝড়-জল লেগেছে। নিচের দিকটা তাই বেশি সুরক্ষিত ও কোমল হওয়ায় উত্তেজনার ক্রিয়া সেখানে বেশি হবে। তাই দুপুরের তাপ জায়গাটা যখন উত্তেজিত করে, তখন তলা আর ওপরের অসমান সংকোচনে গাছের মাথাটা নেমে যায়। এইভাবে সরেজমিনে তদন্ত চালিয়ে জগদীশচন্দ্র এদেশে অলৌকিক ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করলেন।

অনুশীলনী

১। জেনে নিয়ে লেখো :

(ক) জগদীশচন্দ্রের পুরো নাম। তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

(খ) আবিষ্কারক হিসেবে কেন তাঁর এত নামযশ ?

(গ) বাংলায় লেখা তাঁর একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম করো।

২। অদ্ভুত খেজুর গাছটি সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র কেন অনুসন্ধানের প্রয়োজন বোধ করলেন ?

৩। জগদীশচন্দ্র কিভাবে অদ্ভুত খেজুর গাছটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে অলৌকিক ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন ?

৪। নিচের শব্দগুলির বহুবচন লেখো :

গাছ, তিনি, রোগী, এ, কারিগর, একে একে।

৫। 'অ' যোগ ক'রে এক কথায় সমার্থ লেখো :

লৌকিক নয় ; সমান নয় ; বৈজ্ঞানিক নয় ; সংকোচ নেই ; সম্ভব নয়।

৬। বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

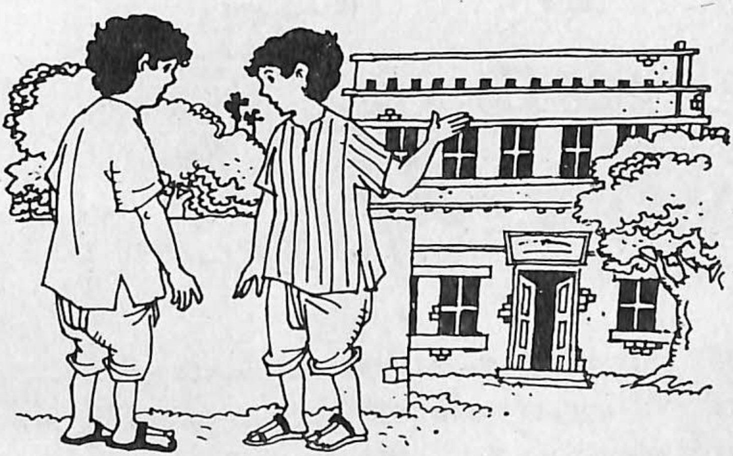
কাত, বিলিতি, কোমল, তলা, ওঠা।

ছুটির পরে

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

(১৮৬১-১৯৪২): জন্ম—খানাকুল, ফরিদপুর। সুকবি, ভাষাতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ্ এবং প্রখ্যাত গবেষক।

অনু কহে, 'অজুদাদা ! পড়ে গেলাম মুশকিলে ঃ
ফুরিয়ে গেল পূজার ছুটি, যেতেই হবে ইস্কুলে।'
অজু কহে, 'বলিস কী রে ? দেখতে দেখতে একটি মাস
ফুরিয়ে গেল — ভাতের সাথে ফুরায় যেমন ভেট্‌কি মাছ !'



অনু কহে, 'কাটে যেমন শীতের রাত্রি হঠাৎ-ই —
মাস্টারেরই পায়ের শব্দে বেজায় ভোরে নটাতেই।'
এখন উপায় ? কোথায় পুঁথি, কোথায় কাগজ কলম গো ?
শুনলেই হত কাকার কথা, গেলেই হত কলম্বো !

তা না কোথায় বাবার কথায় কাছের গোড়ায় সুট্‌ ক'রে,
চলে গিয়ে ফিরে এলাম এক্কেবারে ছুট্‌ ক'রে।
পারলাম নাকো ভালো ক'রে চড়তে গাছে, সাঁতরাতে;
দুদিন বাদেই পড়লাম ফাঁদে, হবেই পুঁথি হাত্‌ড়াতে।

অনুশীলনী

১। কবিতাটির প্রথম ছ' লাইন মুখস্থ বলো।

২। ছুটি ফুরোলে অনুর মন খারাপ হয় অথচ কারো কারো কেন ভালো লাগে?

৩। নতুন মিল দাওঃ

(ক) ইস্কুলে।
—— ——॥

(খ) সুট্‌ ক'রে।
—— ——॥

(গ) ভেট্‌কি।
—— ——॥

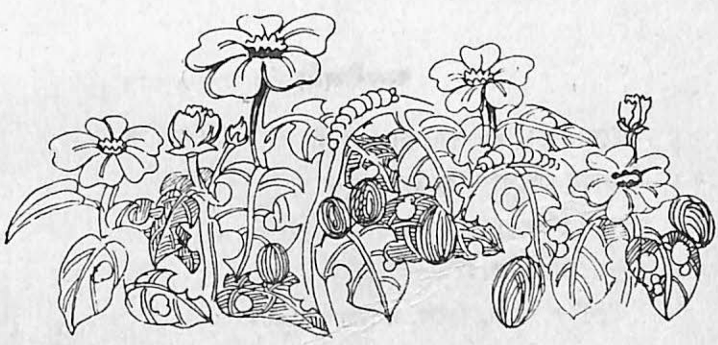
(ঘ) সাঁতরায়।
—— ——॥

প্রাণী থেকে দামী জিনিস

অমরনাথ রায়

(১৯৩০-　　): জন্ম—বারিপদা, উড়িষ্যা। পিতা আদিত্যনাথ। শিক্ষকতায় নিযুক্ত। আবিষ্কারের কথা ও বিজ্ঞান রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত।

মানুষে এক বিশেষ জাতের (মথ) প্রজাপতি পুষে থাকে। এই প্রজাপতিরা পোস্তদানার মতো ছোট ছোট ডিম পাড়ে। এই ডিম থেকে বেরোয় যে পোকা তার নাম গুটি পোকা। গুটি পোকারা ভারি পেটুক। রাশি রাশি গাছের পাতা খায় আর বড় হয়। এমনি ভাবেই দিন যায়।



এক সময়ে হঠাৎ ঐ গুটিপোকাদের খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। তারা তখন মুখ দিয়ে কৌশলে সুতো কাটতে আরম্ভ ক'রে দেয়। কিন্তু কাটা সুতো জড়াবার নাটাই তো নেই ওদের। তাই ওরা নিজেদের দেহকে ঘিরে সুতো জড়াতে থাকে।

গুটি পোকার সুতো কাটার কৌশলটা তোমাদের কাছে ফাঁস ক'রে দিচ্ছি। ওদের চোয়ালের নিচে দুটো সরু নল আছে। ঐ নল দিয়ে দেহ থেকে ওরা একরকম আঠালো রস ক্রমাগত বার ক'রে চলে।

বাতাসে তা শুকিয়ে সুতোর মতো হয়ে যায়। সুতোর রংটা হয় ফিকে সোনালী।

পুরো তিনটি দিন কিছু না খেয়ে গুটিপোকা সুতো কেটে যায় এবং কাটা সুতো জড়িয়ে নিজের দেহটাকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলে। তার পর সুতো কাটা বন্ধ ক'রে রেশমের গুটির মধ্যে চুপটি ক'রে পড়ে থাকে। ঐ সময় ওদের দেহে পরিবর্তন হতে থাকে। পরিবর্তনটা আর কিছু নয়—গুটি পোকা থেকে প্রজাপতি।

লোভী মানুষ কিন্তু রেশমের লোভে ওদের বড় হতে দেয় না। রেশমগুটি বা কোকুনকে গরম জলে ফেলে দেয়। ফলে বেচারি মরে যায়। মানুষ তখন রেশম সংগ্রহ করে। কয়েকটি গুটিপোকাকে অবশ্য প্রজাপতি হবার সুযোগ দেওয়া হয়। তা না হলে ওদের বংশ লোপ পাবে যে!

অনুশীলনী

১। গুটিপোকাদের সম্বন্ধে যা জানো বলো।

২। কীভাবে গুটিপোকা সুতো কাটে?

৩। রেশম তৈরির পূর্বাপর পদ্ধতিটা কী?

৪। বাক্য তৈরি করো:

পেটুক, ফাঁস, ফিকে, লোপ, লোভী।

৫। বিশেষণের বিশেষণ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

(ক) ওরা —— আঠালো রস ক্রমাগত বার ক'রে চলে।

(খ) গুটিপোকারা —— পেটুক।

(গ) মানুষে —— বিশেষ জাতের প্রজাপতি পুষে থাকে।

(ঘ) রেশমের সুতোর রংটা হয় —— সোনালী।

বুড়ো শীতকাল

নরেন্দ্র দেব

(১৮৮৮-১৯৭৭) : জন্ম—ঠনঠনিয়া, কলকাতা। পিতা নগেন্দ্রচন্দ্র। পত্নী কবি রাধারাণী দেবী। ছাত্র বয়স থেকেই কবিতা লিখতেন।

পৌষালী দিন জুড়ে
ঝাপসা কুয়াশা ফুঁড়ে
চুপিসাড়ে এলো কুঁড়ে
বুড়ো শীতকাল!
ওরে বুড়ো শীতকাল!

মাথায় রুক্ষ জটা
দাড়ি-গোঁফ্ কটা কটা,
খড়ি-ওঠা রং-চটা
তোব্ড়া দু'-গাল!
বুড়ো শীতকাল!

চোখ ছোট, নাক মোটা
কান পুরু, ঠোঁট ফাটা
হাতে পায়ে খাঁজ কাটা
ভাঁজ পড়া ছাল!
বুড়ো শীতকাল!



জড়সড় হয়ে ব'সে
আগুন পোহায় ক'ষে
বরফের দেশ চ'ষে
যেন সে নাকাল—
বুড়ো শীতকাল !

অনুশীলনী

১। বুড়ো শীতকালের রূপ বর্ণনা করো।

২। বাক্য তৈরি করো :

চুপিসাড়ে, দাড়িগোঁফ, জড়সড়, নাকাল।

৩। সমার্থক শব্দ বসাও :

ঝাপসা, কুঁড়ে, রুক্ষ, ঠোঁট, নাকাল, কুয়াশা।

জানোয়ার জানা

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯২২-): জন্ম—কলকাতা। পিতা দুর্গানন্দ। সাংবাদিকতা ক'রে লেখা শুরু করেন। ছোটদের জন্য গল্প, উপন্যাস ও পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন।

জানোয়ার হল জানবার জিনিস। একই প্রকৃতির ছেলেমেয়ে হিসেবে আমরা আর ওরা হলাম ভাই ভাই।

জীবজন্তুর পরমায়ু নিয়ে কথা হচ্ছিল।

হঠাৎ পিক্‌লু একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। আমি ওর মনের কথা আঁচ ক'রে বললাম,

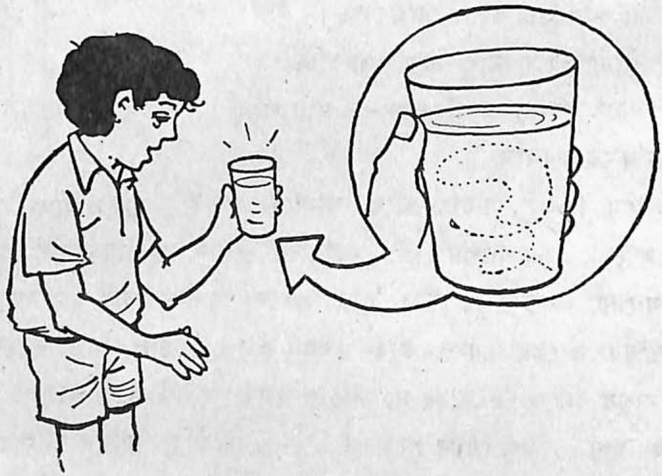
'হ্যাঁ পিক্‌লু, সাধারণভাবে আমাদের সবাইকে মরতে হবে। তবে কি জানো, এসব ব্যাপারে ঐ "অল্পবিস্তর" কথাটা ব্যবহার করাই ভালো। আমাদের জ্ঞানের ভাঁড়ার ঘরে এখনো অনেক কথাই জমা পড়েনি। মানুষের কাছের যেসব জীব—যেমন কুকুর, বেড়াল, বাঘ, ভাল্লুক বা বা মানুষ নিজে — এদের মরা-বাঁচার ঠিকুজী কুলজী ইচ্ছে করলেই ক'রে ফেলা যায়। কিন্তু যেসব সরল বা নীচু স্তরের জীব, যাদের খালি চোখে দেখাই বেশির ভাগ সময়ে হয়ে ওঠে না, তাদের বেলায় কিন্তু বাধে মুশকিল।

'একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধরো, একটা খুব ছোট্ট চোখে-ধরা-না-পড়া "বেয়ার অ্যানিম্যালকিউল্‌"—এই জলের জীবটি খুব নেচেকুঁদে জলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ধরো, সে যে পুকুরে থাকত তার জল গেল শুকিয়ে। তখন আমাদের এই ছোট্ট জীবটির কী হল ? সে-ও গেল শুকিয়ে। কুঁক্‌ড়ে এক কণা জৈব "ধূলিকণা" হয়ে পড়ল সে।

'জলের অভাবে সে কি মরে গেল ? তাই তো মনে হচ্ছে।

'ধরো, এইরকম অবস্থায় তার দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল— বছরও ঘুরে এল। তারপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। এই অবস্থায় একদিন সেই জৈব ধুলোর কণাটাকে হঠাৎ জলে চুবিয়ে দেওয়া হল।

'বেশ কিছুক্ষণ কাটল। খুব আস্তে আস্তে জলের মধ্যে সেই ধূলি-কণা নড়েচড়ে উঠল। গা ভারী হল। আর তখন সে আবার একটা "বেয়ার অ্যানিম্যালকিউল" হয়ে গেল। নেচেকুঁদে সে প্রমাণ করল, সে খুব জ্যান্ত।



'কী আশ্চর্য বলো তো, পিকলু? ঐ জৈব ধূলিকণাটার কথা ভাবো। ওর জীবনের নিয়ম তো দেখা যাচ্ছে অন্যভাবে ঠিক হয়। জীবনটাকে ঠিক যেখানে সে ছেড়ে রেখে গিয়েছিল, ঠিক সেখানেই সে আবার তা ফিরে পেল।'

তবে? মরা আর বাঁচার গল্প খুব অদ্ভুত। এই বিষয়ে শেষ কথা বলা যায় না। আমরা যে সব কথা একেবারে সাংঘাতিক সত্যি বলে খুব তর্ক করি, সে সম্বন্ধে মনটাকে খোলা রেখে চলাই বোধ হয় ভালো।

অনুশীলনী

১। নিচের কথাগুলো মুখস্থ ক'রে একনিশ্বাসে বলো তো :

কিংকর্তব্যবিমূঢ়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, জবাকুসুমসঙ্কাশং, বারোআনিমালিকুল, বেয়ার অ্যানিম্যালকিউল।

২। 'বেয়ার অ্যানিম্যালকিউল' অন্য প্রাণীর চেয়ে কেন আলাদা? ওদের মরা-বাঁচা সম্বন্ধে যা জানো বলো।

৩। বাক্য তৈরি করো :

পরমায়ু, অন্যমনস্ক, অল্পবিস্তর, নেচেকুঁদে।

৪। বন্ধনী থেকে বেছে নিয়ে ফাঁক পূরণ করো :

(ক) —— আর —— অর্থে এক, বানানে ভিন্ন। (ধূলি, ধুলো)

(খ) —— আর —— শব্দ দুটিরও বানান আলাদা। (চূর্ণ, চুন)

(গ) —— সব্‌জিটি উদ্ভিদের —— ঠিকই, তবে বানানে ভিন্ন। (মুলো, মূল)

(ঘ) —— কথাটির মধ্যে —— আছে, তবে বানানে পৃথক। (অদ্ভুত, ভূত)

মন্দোদরী

সুধীরকুমার চৌধুরী

লোকান্তরিত খ্যাতনামা কবি। স্ত্রী সুলেখিকা সীতা দেবী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা।



রাবণ রাজা মস্ত রাজা, দশটা মাথা ঘাড়ে,
দশ রকমের ফন্দি মাথায় জোগাত একবারে।
এক সাথে দশ দিকে দৃষ্টি,
উলটে বেড়ান সকল সৃষ্টি
হয় না সাহস কারুর তাঁকে বলতে কিছু পারে।

মন্দোদরী ভাগ্যবতী
তাই পেয়েছেন অমন পতি,
ভাবত এবং বলত যারা, জানত না তো তারা,
রাবণ যখন দশটা নাকে
ডাক শোনাতেন রাত্রে তাঁকে,
তখন মন্দোদরীর দশা হত কেমনধারা!

দশটা মাথা ধরলে রাতে
টিপতে হত একলা হাতে,
অবিশ্যি তাঁর ধরত মাথা, কষ্ট ছিল তাঁরও;
দশ মুখে দশ রকম রুচি,
কার যে ঘি-ভাত, কার যে লুচি,
হিসেবটা রোজ গুলিয়ে যেত,—সে সব কথা ছাড়ো।

অনুশীলনী

১। মন্দোদরী কে? তাঁকে কেন এবং কী কী মুশকিলে পড়তে হত?

২। শুনে লেখো:
পতি, ভাগ্যবতী, রাবণ, মন্দোদরী।

৩। বাক্য তৈরি করো:
ফন্দি, দশা, রুচি, কেমনধারা, হিসেব।

৪। কবিতাটির মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয় তোমার খুব ভালো লেগেছে? কেন?

খড়িবাজ মুখ্যু

চিন্মোহন সেহানবীশ

(১৯১৩-   ) : জন্ম—লাহোর। পিতা বিনয়মোহন। তিনি রাজনীতি ও সাহিত্যরচনায় নিযুক্ত।

রেলগাড়ির কামরায় মাত্র দুজন যাত্রী। একজনের ফরসা দোহারা চেহারা, গায়ে ধপ্‌ধপে দামী পোশাক, চোখে পুরু কাঁচের চশমা, ঠোঁটে লম্বা চুরুট, হাতে মোটা কেতাব।

দেখলেই বোঝা যায়—ভীষণ পণ্ডিত!

আর একজনের কালো শুঁটকো চেহারা, গায়ে ছেঁড়া নোংরা জামা, চোখে আর ঠোঁটে রাজ্যের ফিচেল বুদ্ধি, হাতে নিশ্‌পিশ্‌ ভাব। দেখলেই সন্দেহ হয়—টিকিট আছে তো?

গাড়ি চলেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে—মাইলের পর মাইল।

পণ্ডিত-ভদ্রলোক কেতাব থেকে মাথাই তোলেন না, খালি পাতার পর পাতা ওল্‌টান, এখানে ওখানে লাল পেন্সিলের ঢ্যাড়া মারেন আর ধোঁয়া ছাড়েন মাঝে মাঝে।

শুঁটকো লোকটি জানলার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাই তোলে, খানিকক্ষণ ঢোলে, তারপরে ঝিমোয়, তারপর চোখ রগ্‌ড়ে কী করবে ভেবে পায় না।

শেষ পর্যন্ত আর পারল না। অতিষ্ঠ হয়ে, গলা খাঁকারি দিয়ে, মাটির সঙ্গে মিশে শুঁটকো বলল, 'দেখুন, কিছু মনে করবেন না। মুখ বুঁজে আর ত পারিনে। আপনার ঐ যে সব মোটা মোটা, ভারী ভারী কেতাব, বুঝতেই পারছেন ও রাজ্যে আমার প্রবেশ নিষেধ। আমি মুখ্যু বোকা মানুষ। বরং আমি যা পারি আপনি যদি তাতে যোগ দিতে রাজী থাকেন তা হলে সময়টা কাটে।'

পণ্ডিত চশমার উপর দিয়ে এতক্ষণে সহযাত্রীকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'বিলক্ষণ, তা তুমি কী পারো ?'

'আজ্ঞে, আমি বাজি ধরতে পারি। আর কিছুই আসে না তেমন।'

পণ্ডিত ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন, 'বাজি ? আচ্ছা বেশ, তাই হোক। তা কী নিয়ে ধরবে বাজি ?'



শুঁটকো বলল, 'প্রশ্ন নিয়েই বাজি ধরা হোক। আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন, আমিও আপনাকে পাল্টা প্রশ্ন করব। তবে দেখুন, আপনি হলেন পণ্ডিত মানুষ, দুনিয়ার সব কিছুই খবর রাখেন। তাই আমার প্রশ্নের জবাব দিতে না পারলে আপনি আমায় দশ টাকা দেবেন। আর আমি ত মুখ্যু মানুষ— কিছুই জানিনে। আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে আপনাকে পাঁচ টাকা দেব। রাজী আছেন ত ?'

পণ্ডিত বললেন, 'এ ত খুবই ন্যায্য কথা।'

শুঁটকো ফের বলল, 'আর একটা কথা। আমি বোকা মানুষ।

আমায় প্রশ্ন করতে দেওয়া হোক গোড়ায়। কী বলেন ?'

পণ্ডিত মাথা নেড়ে জানালেন — এতে আর কথা কী !

শুঁটকো তখন শুধোলো : 'কোন্ সে জীব যার হাজারটা মাথা আকাশ ছোঁয় আর হাজারটা ল্যাজ লুটোয় মাটিতে ?'

পণ্ডিত বারবার চুরুট টানলেন, ধোঁয়া ছাড়লেন, ভুরু কোঁচকালেন, বিড়বিড় ক'রে আপন মনে কি সব বকলেন, তারপর পকেট থেকে দশ টাকা বার ক'রে শুঁটকোর হাতে দিয়ে বললেন, 'হার মানলাম, কিন্তু কী সে জীব ?'

শুঁটকো অম্লানবদনে জবাব দিলে, 'আমিও কি ছাই জানি !' বলেই পণ্ডিতকে ফেরত দিল পাঁচ টাকা।

অনুশীলনী

১। পণ্ডিত আর শুঁটকো — কে কি রকম দেখতে ?

২। মুখ্যু লোকটা কী-ভাবে ঐ পণ্ডিত লোকটাকে ঠকালো ?

৩। জেনে নিয়ে মানে লেখো :

ফিচেল, ঢ্যাঁড়া, কেতাব, অতিষ্ঠ, চুরুট, অম্লানবদনে, মাটির সঙ্গে মিশে, রাজী, বাজি।

৪। পণ্ডিত মানুষটার একটা ছবি আঁকতে পারো ?

৫। নিচের বিশেষ্য পদগুলির উপযুক্ত বিশেষণ পদ লেখো :

——— পোশাক ; ——— কেতাব ; ——— চুরুট ;
——— বুদ্ধি ; ——— প্রশ্ন ; ——— মানুষ ; ——— চেহারা ;
——— চশমা ; ——— জামা ; ——— পেনসিল।

গ্রামের ছবি

অমিয় চক্রবর্তী

(১৯০১-১৯৮৬) : জন্ম—শ্রীরামপুর, হুগলী। পিতা দ্বিজেশ। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পাস ক'রে লণ্ডনে গবেষণা করেন এবং ডক্টরেট পান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একান্ত সচিব ছিলেন, পরে আমেরিকায় অধ্যাপনা করেন।



এরা আমার আত্মীয় সব
মস্ত আমার পাড়া —
নদী থেকে দেখি নৌকোয়
ভেসেছি ঘর ছাড়া !

আম জাম তাল সুপুরির বন
নারকল আর কলা
ঘোলা বরণ শ্রাবণী জল
বইছে তার তলা;

সারি সারি গ্রামের ছবি

বুকের কাছাকাছি—

কাঁচা মাঠে বৃষ্টিতে ঐ

ধানের সঙ্গে বাঁচি ॥

অনুশীলনী

১। কবি কাদের 'আমার আত্মীয়' আর 'আমার পাড়া' বলছেন ?

২। কবিতাটি মুখস্থ বলো।

৩। মিল দাও :

আত্মীয়, নারকল, কাছাকাছি।

৪। পড়তে পড়তে কোথায় কোথায় থামছ, পাশে ইলেক (/) দিয়ে দেখাও :

যেমন : 'আম জাম তাল / সুপুরির বন / নারকল আর / কলা'

(ক) এরা আমার আত্মীয় সব মস্ত আমার পাড়া

(খ) ঘোলা বরণ শ্রাবণী জল বইছে তার তলা

(গ) কাঁচা মাঠে বৃষ্টিতে ঐ ধানের সঙ্গে বাঁচি

জঙ্গল-মহলে

বুদ্ধদেব গুহ

(১৯৩৬-) : জন্ম—কলকাতা। বনে-জঙ্গলে ঘোরার অভিজ্ঞতা থেকে গল্প-উপন্যাস লেখেন।

কের বাংলো পুরনো দিনের ফরেস্ট বাংলো। এখান থেকে বেতলা তিন মাইল। ছিপাদোহরও তাই। বিরাট বিরাট ঘর, বিরাট বিরাট বাথরুম। বড় টাবে জল রাখা আছে চান করার জন্যে।

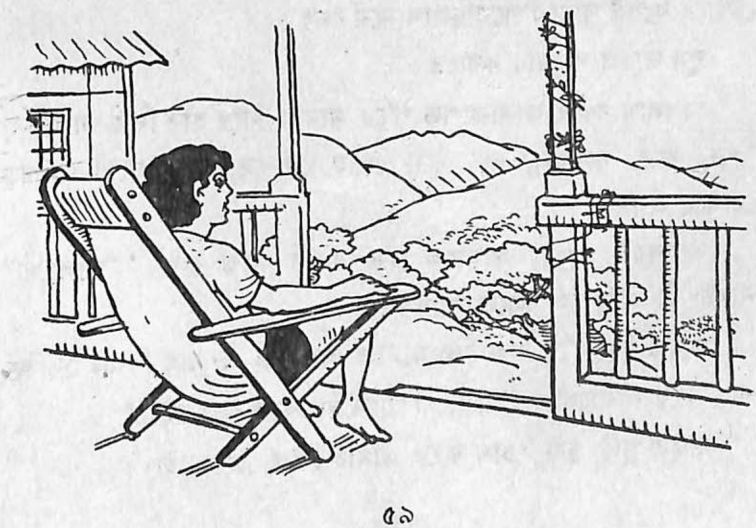
আমরা চান-টান ক'রে খেতে বসলাম।

বিউলির ডাল, আলুপোস্ত, মুরগীর পাতলা ঝোল, কাঁচা আম আদা লঙ্কা দিয়ে বাটা চাটনি, পুদিনার চাটনি এবং পুডিং।

খেয়ে-দেয়ে উঠে, বারান্দার ইজিচেয়ারে ঋজুদা একটা বই নিয়ে পাইপ ধরিয়ে বসল।

আমিও অন্য একটা ইজিচেয়ারে বসলাম।

বাংলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগল এই বারান্দাগুলো। সামনে



ও পিছনে প্রকাণ্ড চওড়া বারান্দা। আমরা এখন সামনের বারান্দায় বসে আছি। সামনেই পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে গেছে। এখন একটু লু-এর মতো হাওয়া বইছে। গরম রুক্ষ হাওয়া। একটু বসলেই চোখ শুকিয়ে আসে।

ধুলোর ঝড় উঠছে পাহাড়ে-পাহাড়ে। শুকনো শালপাতা উড়িয়ে, গড়িয়ে, নাচিয়ে, ভাসিয়ে, যাচ্ছেতাই করছে হাওয়াটা। মচ্‌মচ্‌ সড়সড় শব্দ উঠছে হাওয়ার তোড়ে। আবার যেই হাওয়াটা শান্ত হচ্ছে অমনি বনের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠছে যেন—চাপা। যেন বনের কত কষ্ট।

কের বস্তি কাছেই। কোনো মাটির ঘরে কে যেন ধান কি অন্য কিছু কুটছে। তার একটানা গুপ্‌গুপ্‌ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কুয়োতলায় ল্যাংটা ছেলে চান করছে ভরদুপুরে—লাটাখাম্বা উঠছে নামছে ক্যাঁচোরকোঁচোর। রোগা গরু লেজ দিয়ে গায়ে-বসা মাছি তাড়াচ্ছে। বলিরেখাময় মুখ নিয়ে এক আন্ডিকালের বুড়ি একটা সাদা-জমিন লাল-পাড়ের ময়লা দেহাতী শাড়ি প'রে বসে ছুঁচের মাথায় নীল সুতো পরিয়ে কী যেন সেলাই করছে। ঘুঘু ডাকছে একটানা ঘুমপাড়ানী সুরে—ঘুররররর-ঘু, ঘুঘুর-র-র-র-র—ঘু।

সব কিছু মিলিয়ে, আর কিছু করার না থাকাতে, কখন যে ইজি-চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই।

ঘুম ভাঙল ঋজুদার কথাতে।

দেখলাম ঋজুদা জামাকাপড় প'রে আমার কাঁধে হাত দিয়ে ডাকছেন, 'রুদ্র, রুদ্র, চল্‌-চল্‌, মুখ ধুয়ে খেয়ে নে, তোকে পালামৌ-এর গড় দেখিয়ে আনি।'

তারপরই ঋজুদা আমাকে জব্দ করার জন্যে বলল, '"পালামৌ" নামটা কী ক'রে হল বলতে পারিস ?'

আমি টক্‌ ক'রে বলে দিলাম, 'পল-আম্ম্‌-উ — এই তিনটি দ্রাবিড় শব্দ নিয়ে পালামৌ। পালামৌ মানে দাঁত-বের-করা-নদী।'

ঋজুদা দুষ্টু দুষ্টু চোখ ক'রে আমার দিকে চেয়ে রইল।

বলল, 'করেছিস কী ? এত তুই জানলি কী ক'রে ? আমি তো সেদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে একটা বই ঘাঁটতে নামটা কী ক'রে হল জানলাম।'

আমি হাসছিলাম। জীবনে এই প্রথমবার ঋজুদাকে অন্তত একটা ব্যাপারে সমানে-সমানে টেক্কা দিতে পারায় আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল।

অনুশীলনী

১। কের বাংলোর বারান্দায় ব'সে লেখকের কী চোখে পড়েছিল আর কানে এসেছিল ?

২। 'পালামৌ' নামটা কী ক'রে হল ?

৩। জেনে নিয়ে মানে বলো :

পাইপ, লু, তোড়, লাটাখাম্বা, দ্রাবিড়, টেক্কা দেওয়া, জব্দ, দেহাতী।

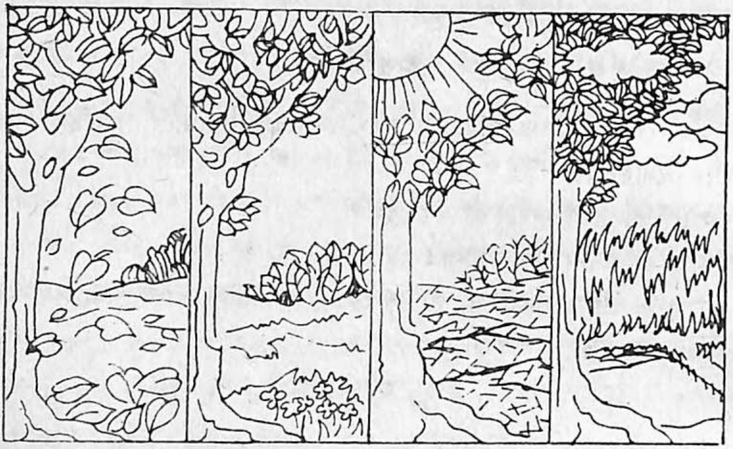
৪। বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

বিরাট, পাতলা, কাঁচা, শুকনো, চাপা, রুক্ষ, কিছু।

গানের মানে

সত্যজিৎ রায়

(১৯২১-   ) : জন্ম—কলকাতা। সুকুমার রায়ের পুত্র, চলচ্চিত্রকার, ছোটদেরও প্রিয় গল্প-লেখক।



শীতকালেতে গাছের পাতা পড়বে যখন ঝ'রে
গানটা আমি গাইব তোমার কানে,
বসন্তেতে সবুজ কচি ধরলে গাছের 'পরে
তোমায় ডেকে বলব গানের মানে।
গ্রীষ্মকালে গাঁয়ের মাটি উঠবে যখন তেতে
গানের মানে ঢুকবে তোমার মাথায়,
শরৎকালে সোনার ফসল ফললে পরে ক্ষেতে
গানটা লিখে রাখতে পার খাতায়॥

অনুশীলনী

১। কোন্ কোন্ ঋতুতে গানের বিষয়ে কবি ও শ্রোতা কী করবেন ?

২। 'শীতকালেতে', 'বসন্তেতে', ''পরে' — শব্দগুলো পদ্যে কেন দরকার হল ?

পটকান পালোয়ান

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

(১৯৩৫-) : উত্তরবঙ্গের সন্তান। বাংলায় এম্ এ পাস ক'রে সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় নিযুক্ত।

পটকান পালোয়ান ছিল শেরপুরের গর্ব। সে চেহারা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ষাট ইঞ্চি বুক, আশি ইঞ্চি পেট, গরিলার মত হাত-পা। শরীরটার কোথাও কোন ভেজাল নেই। ভুঁড়িখানা ঢালের মত শক্ত। পটকান পালোয়ান ভুঁড়ি দিয়ে বিস্তর কুস্তিগীরকে চেপে দমসম ক'রে দিয়েছে।

তিন কুলে পটকান পালোয়ানের কেউ ছিল না। খুব অল্প বয়স থেকে ভীষণ খাই-খাই ছিল বলে খিটখিটে বাপ তাকে ঘর থেকে বের ক'রে দেয়। সেই থেকে পটকান বিবাগী। অবশ্য সে বাপ এখন নেই, মা-ও গত হয়েছেন। পটকান তাই একা আনন্দে থাকে। সকালে দঙ্গলে গিয়ে তেল মাটি মাখে, কসরৎ করে, মুগুর ভাঁজে। অসংখ্য ডন-বৈঠক দেয়। এক সের ছোলা দিয়ে সকালে জল খায়। বেলা পড়লে রুটির পাহাড় মাংসের পর্বত দিয়ে শেষ করে। বিকেলে এক পুকুর দুধ আর এক গামলা বাদাম বাটা খায়। রাতে ফের ঘিয়ের পরোটার বংশ লোপ করে চারটে মুরগী দিয়ে। এর ফাঁকে ফাঁকে এন্তার ডিম, সব্জী, মিছরি, সরবৎ চালান হয়ে যায় তার অজান্তে। এ সব ছোটখাটো খাবারগুলো সে খাওয়ার মধ্যে ধরে না।

পটকানের সঙ্গে সেবার লড়তে এল পাঞ্জাবের ভীম সিং, তারও বিশাল চেহারা। খাওয়াদাওয়াও প্রায় পটকানের সমান। জমিদারের কাছারি বাড়িতে লোক ভেঙে পড়ল কুস্তি দেখতে। পটকান ভীম সিংকে তিন মিনিটে চিত ক'রে হাত ঝেড়ে বলল— ছোঃ! জমিদারের

দিকে চেয়ে হাতজোড় ক'রে বলল — হুজুর, বেয়াদপি মাপ করবেন। কিন্তু এসব চ্যাংড়া-প্যাংড়ার সঙ্গে লড়ার জন্য আমাকে ডাকা কেন ?

সবাই ভাবে, ঠিক কথা, কিন্তু মুশকিল হল পটকান লড়বেই বা কার সঙ্গে ? দেশ-বিদেশ থেকে যারাই লড়তে আসে, সে যত বড় ওস্তাদই হোক, পটকান তিন মিনিটের বেশি সময় নেয় না। লড়াইয়ের শেষে আবার বলে — ছোঃ ! জমিদারের দিকে চেয়ে অভিমানের সঙ্গে বলে — আনাড়িদের সঙ্গেই কি আমাকে বরাবর লড়তে হবে হুজুর ?

জমিদারমশাই মহা সমস্যায় পড়ে বললেন — তা বাপু, তোমার যোগ্য কুস্তিগীর পাই কোথায় ? এঁরা যাঁরা আসছেন লড়তে তাঁরাও সব নামডাকের লোক, কিন্তু তোমার কাছে কেউই ধোপে টেকে না দেখি —

—তার চেয়ে হুজুর বন্দোবস্ত করুন, ওরা দু'জন ক'রে আসুক লড়তে, আমি একা।

তাই হল। লড়তে এল বচন পাণ্ডে আর হরি দোসাদ। দু'জনকে দু'বগলে নিয়ে হা হা ক'রে হেসে ওঠে পটকান। তারপর তাদের মাটিতে ফেলে দিয়ে বলে — ছোঃ ছোঃ ! ব'লে জমিদারবাবুর দিকে তাকায় — হুজুর, দেশে কি আর মানুষ পাওয়া গেল না !

জমিদারমশাই মিইয়ে গিয়ে বললেন — তাই ত ! এরা ত দেখছি তেমন কিছু নয়। অথচ শুনেছিলাম এরা কিলিয়ে পাথর ভাঙে, পাঁচ মণ ওজন তোলে এক-এক হাতে, হাতি বুকে নেয়। সে সব ত গল্প-কথা নয় বাপু, নিজের চোখে দেখেই এসেছি। আচ্ছা দেখি, তোমার উপযুক্ত যদি কাউকে পাই।

এরপর তিন পালোয়ান লড়তে এল একসঙ্গে। ভীষণ ভীষণ তাদের চেহারা। গোল্লা গোল্লা ক'রে চায় আর দাঁত কিড়মিড় করে। তা, সেই তিনজন যখন লড়তে নামল তখন বেলুন চুপসে আমসত্ত্ব হয়ে গেল ফের। তিনটেকে নিয়ে খানিক লোফালুফি খেলল পটকান, চেঁচিয়ে জমিদারমশাইকে বলল — হুজুর যখন বলবেন তখনই তিনজনকে মাটিতে ফেলব।



ফেললও তাই, তিনবার ছোঃ দিয়ে জমিদারমশাইয়ের দিকে তাকাতেই জমিদারমশাই বেজায় ভয়-খাওয়া মুখ ক'রে মিন মিন করলেন — তাই ত বাপু, এ ত বড় মুশকিলে ফেললে তুমি!

খুব বড় একটা শ্বাস ফেলে পটকান বলল — এরকম চললে আমাকে

সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে যেতে হবে দেখছি।

এই কথায় সবাই ভারি চিন্তিত হয়ে পড়ে। জমিদারমশাইয়ের একেই হার্টের ব্যামো, বাঁ পায়ে বাতব্যাধি, রক্তচাপের রোগ, রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, পেটটা ভুটভাট করে সব সময়ে। তার ওপর পটকানের এই কথা শুনে তিনি প্রায় অন্নজল ছাড়েন আর কি! শেরপুরের গর্ব পটকান পালোয়ান সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে গেলে লজ্জার সীমা থাকবে না!

শেরপুরের লোকেরা ভীষণ বিমর্ষ। পটকানের সঙ্গে কেউ লড়ে পারে না সে ঠিক, কিন্তু তা ব'লে একটু লড়াই হবে ত, কিছুক্ষণ কোস্তা-কুস্তি ক'রে তবে চিত হবি। এ যেন সব হেরোর দল মাটি নেওয়ার জন্যই আসে। এইসব হেরোর দলকে শেরপুরের লোকেরা হারু ব'লে উল্লেখ করে। জেতে ব'লে পটকানের নাম তারা দিয়েছে জিতেন। সবাই বলাবলি করে— জিতেনের সঙ্গে এবার কোন্ হারু লড়তে আসছে রে?

অনুশীলনী

১। পটকান পালোয়ান কেমন দেখতে ছিল? ওর খাওয়ার বহর কেমন ছিল?

২। জিতেন কে? হারুই বা কারা?

৩। জমিদারবাবু কেন বললেন—'তাই ত বাপু, এ ত বড় মুশকিলে ফেললে তুমি!'

৪। মানে জেনে বাক্য লেখো:

দঙ্গল, পালোয়ান, খিটখিটে, খাই খাই, বিবাগী, মাটি নেওয়া, এন্তার, কসরত, বন্দোবস্ত, বিমর্ষ।

৫। নিচের বাক্যের পদগুলি কোনটি কোন্ কারক লেখো:

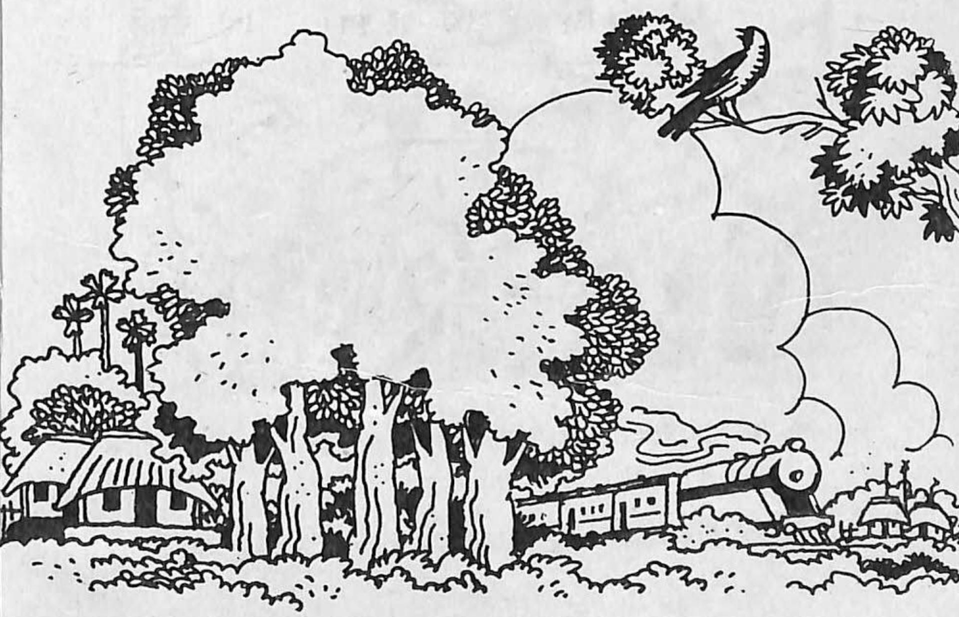
মামীমা হাঁড়ি থেকে চামচে ক'রে দই নিয়ে সবার প্লেটে দিলেন।

ছুটি

হরপ্রসাদ মিত্র

(১৯১৭-   ): জন্ম—দেওঘর, বিহার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা ক'রে বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। কবি হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন। প্রবন্ধ-গ্রন্থ রচনাতেও সিদ্ধহস্ত।

নতুন কোনো রাস্তা চাই,
নতুন কোনো দিক।
ঘড়ির কাঁটা একই বৃত্তে
করুক্ টিক্ টিক্।
কালো মাটিই ফোটায় জানি
হাজার-রঙা ফুল।
নদীকে বেঁধে রাখে না শুধু
নদীর দুই কূল।



আমারও ছুটি ছড়িয়ে আছে
হাজার পথে ঘাটে;
শিউলি বনে যেখানে দিন
আলো-ছায়ায় হাঁটে।

চিকন রেল-রাস্তা খুঁজে
যাবো কোথাও ছুটে।
কাটবে দিন বুলবুলির
সঙ্গে ধান খুঁটে।

অনুশীলনী

১। প্রথম আট লাইন মুখস্থ বলো।

২। ঘড়ির কাঁটা কীভাবে চলে? টিক টিক্ শব্দটা কার?

৩। কবি কীভাবে ছুটি উপভোগ করতে চান?

৪। নিজে ভেবে মিল দাও:

(ক) টিক্ টিক্। (খ) জুই ফুল। (গ) বুলবুলি।

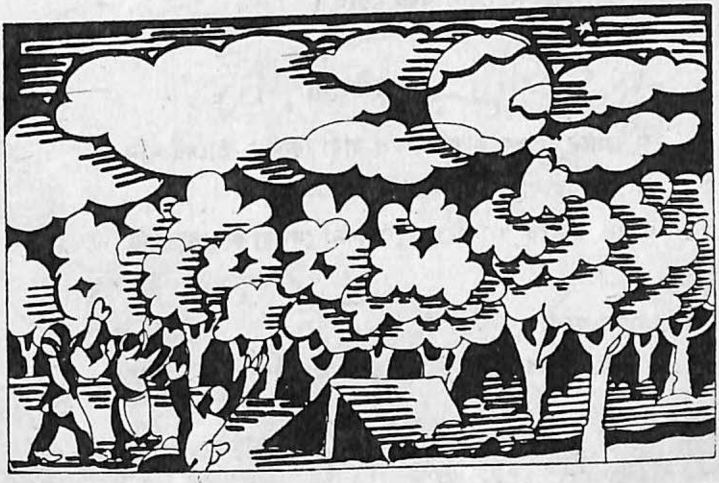
________ ॥ ________ ॥ ________

নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টি

গৌরকিশোর ঘোষ

(১৯২৩-): জন্ম—হাটগোপালপুর, যশোহর। পিতা গিরিজাভূষণ। পত্রিকা সম্পাদনায় যুক্ত। 'রূপদর্শী' ছদ্মনামে নকশা ও স্বনামে উপন্যাস লেখেন। 'বঙ্কিম পুরস্কার' পেয়েছেন।

সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া চুকে গেল। ভাত আর ভেড়ার মাংস। গতকালের 'ডিনারে'ও এই একই মেনু ছিল। ভেড়াটা মারা হয়েছিল রিনিতে দুদিন আগে। সেই মাংস কাঁচা অবস্থায় আমরা বয়ে নিয়ে চলেছি। একটু একটু ক'রে আমরা সেটা গলাধঃকরণ করছি। আশ্চর্য, একটুও নষ্ট হচ্ছে না! মদনের জ্বর হয়েছে। ওকে একটু



কাহিল লাগছে। তবে সে কাহিল হয়েছে দেহে। মনে মনে সে এখনও তাজা।

দু-দিন বৃষ্টির মধ্যে উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁবুর আশ্রয়ে কাটিয়ে দিলাম।

আজও সকাল সকাল তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। ভিতরকার বাতাস ভিজে ভিজে, ভারী ভারী লাগল। আজ কেন যেন চট ক'রে আর ঘুম আসতে চাইছে না। কতক্ষণ জেগেছিলাম, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি নে। অকস্মাৎ প্রচণ্ড হৈ-চৈ চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। বীরেনদাও দেখি তড়াক ক'রে উঠে পড়েছে। বাইরে থেকে নিমাইয়ের গলা শোনা গেল। দিলীপও চেঁচাচ্ছে। বাইরে এস, বাইরে এস জলদি। কী হল রে বাবা, এত রাত্রে! জুতো-ফুতো এঁটে বেরিয়ে পড়লাম তাঁবুর বাইরে। বেরিয়ে দেখি বিরাট জটলা। সবাই এসে গেছে। আকাশের দিকে আঙুল তুলে ওরা বলল, 'দেখ, দেখ।'

দেখলাম, বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘ ছিঁড়ে পূর্ণিমার চাঁদ মুখ বার ক'রে হাসছে। কালো কালো মেঘ দ্রুত ভেসে যাচ্ছে। এক অপার্থিব আলোছায়ার খেলা শুরু হয়েছে। এই পরিবেশে আমাদের ঘোর লেগে গেল। সবাই চেঁচাচ্ছে, লাফাচ্ছে, গান করছে, নাচছে, কোলাকুলি করছে। সবাই যেন পাগল হয়ে গেছি।

অনুশীলনী

১। অভিযানে লেখক ছাড়া আরও যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নাম কি?

২। অভিযানের খাদ্যতালিকায় কি কি ছিল?

৩। তাঁবুর বাইরে আকাশের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেটি নিজের ভাষায় লেখো।

৪। ব্যাখ্যা করো:

আকাশের দিকে আঙুল তুলে ওরা বলল, 'দেখ, দেখ।'

তার হাসি তার খুশি

আনিসা দিলওয়ার

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা ও ছড়া লেখেন।

পাখি বড় ভালোবাসে ছোট মেয়ে শায়রা,
আছে তার দুধসাদা একজোড়া পায়রা ॥
বাকুম বাকুম বাক
বাকুম বাকুম
ওদের মধুর ডাক
চোখে আনে ঘুম।



ডানা মেলে কভু ওরা ওড়ে আকাশে,
তাই দেখে শায়রা যে দাঁড়িয়ে হাসে।

সোনালী হাসিতে তার
পাকা ধান ঝরে
রুপোলী খুশিতে তার
মন প্রাণ ভরে।
তার হাসি তার খুশি সহসা কখন
পৃথিবীকে এনে দেয় পায়রার মন ॥

অনুশীলনী

১। শেষ আট লাইন মুখস্থ বলো।

২। শায়রার পায়রা ক'টি? দেখতে কেমন? ওদের হাসি আর খুশির কী কী রং?

৩। সমার্থক শব্দ লেখো :

পায়রা, ডাক, ঘুম, ডানা, খুশি, সহসা।

৪। একটি ক'রে রঙের নাম বসিয়ে বিশেষণ পদ তৈরি করো :

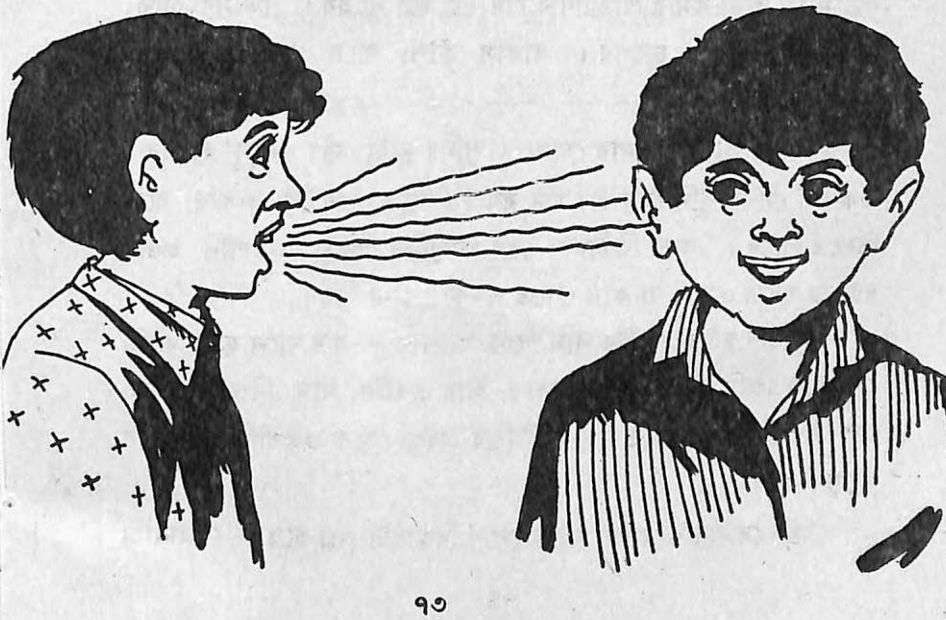
দুধ——, মিশ——, রক্ত——, পাতা——, সোনা——।

গলা চেনা

নির্মল সেনগুপ্ত

কলকাতার বাসিন্দা। পেশায় এঞ্জিনীয়ার। পিতা ডাঃ নরেশচন্দ্র— উপন্যাস লিখতেন। ইনি ছোটদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক লেখা লিখেছেন।

আমরা সবাই জানি শব্দ হচ্ছে এক ধরনের কাঁপুনি — যেমন বাতাসের কাঁপুনি। কোথাও কোনো একটা আওয়াজ হল, সেই আওয়াজের কাঁপুনিতে বাতাস কাঁপতে আরম্ভ করল। বাতাসের সেই কাঁপুনিটা ছড়াতে আরম্ভ করল। তারই একটা ধাক্কা এসে লাগল কারো কানে। সেই ধাক্কায় কানের পরদাও কাঁপতে লাগল। সেই কাঁপুনিটা আবার কাঁপাল কানের একটা যন্ত্র। ইওরোপীয়রা যন্ত্রটাকে বলে 'পিয়ানো'। আমরা বলব — 'বীণা', কানের বীণা। সেই বীণার তারের কাঁপুনি শেষ



অবধি গিয়ে সাড়া জাগাল মানুষটির মগজে। তখন বলা হল, লোকটি আওয়াজ 'শুনল'।

কিন্তু সব কাঁপুনিই কী শব্দ ?

সেকেণ্ডে দু-দশবার কাঁপুনি চোখে ধরা যায়, কিন্তু কানে মালুম হয় না। তারপর কাঁপুনির মাত্রা বাড়তে বাড়তে এমন একটা জায়গায় আসে, যখন সেটা চোখে আর কাঁপুনি বলে ধরা যায় না। যেমন ধরা যাক, এ-সি সাপ্লাইএ জ্বলা আলো। এ-সি বিদ্যুৎ যা আমরা কলকাতার কোথাও কোথাও পাই তা সেকেণ্ডে পঞ্চাশবার পাল্‌টা-পাল্‌টি করে, অর্থাৎ কাঁপে। এই অস্থির বিদ্যুতে যে আলো জ্বলে, সেটাও সেকেণ্ডে পঞ্চাশবার, বিদ্যুতের তালে তালে, বাড়ে আর কমে। কিন্তু আলোর সে বাড়া-কমা বা কাঁপা চোখে আর সহজে ধরা যায় না — চোখের কোণা দিয়ে দেখলে একটু একটু বোঝা যায় — আলোটা স্থির বা নিষ্কম্প নয়, ওটা থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে।

কিন্তু বাতাস যদি সেকেণ্ডে পঞ্চাশবার থর্ থর্ ক'রে কাঁপে, সেটা কানে ধরা পড়তে শুরু করে — অবশ্য আওয়াজটা যদি নেহাৎ ক্ষীণ না হয়, মানে বাড়া-কমার পরিমাণটা যদি খুব অল্প না হয়। কিসের বাড়া-কমা ? বাতাসের চাপের। বাতাস কাঁপা মানে বাতাসের চাপ বাড়া-কমা।

তাহলে, কানে-শোনার যোগ্য কাঁপুনির দুটো গুণ থাকা দরকার। এক হল সে কাঁপুনি যেন এত ঘন ঘন হয় যাতে সেটা লোকে শব্দ বলে চিনতে পারে। আর দ্বিতীয়তঃ সেই কাঁপুনির বহরটা এতখানি হওয়া দরকার যাতে এমনি বা কান পেতে শব্দটা শোনা যায়।

এই গুণ দুটির একটির নাম হচ্ছে কম্পাঙ্ক — যার মানে হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে জিনিসটা কতবার কাঁপে ; আর একটির নাম বিস্তার অর্থাৎ এক-একখানা কাঁপুনিতে জিনিসটি স্থির অবস্থা থেকে কতখানি ওঠে আর পড়ে।

যেমন দোলনায় দোলা আস্তে দিলে বিস্তারটা অল্প হবে — দোলনাটা

উঠবে কম, পড়বে কম। জোরে দোলা দিলে বিস্তার বেশি হবে। তেমনি শব্দের বেলায় চেঁচিয়ে কথা বললে, বাতাসের চাপের বাড়া কমা বা বিস্তার বেশি হবে, ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা বললে, বিস্তারটা কম হবে।

অনুশীলনী

১। শব্দ কী? আওয়াজ কীভাবে কানে ধরা পড়ে?

২। বাতাসের কাঁপুনি কী-রকমের হলে তবে আমরা শুনতে পাই?

৩। বাক্য তৈরি করো:

ধাক্কা, পরদা, মগজ, মালুম, ফিসফিস, বিস্তার।

৪। নিচের তালিকা থেকে লাগসই কথাগুলো বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো:

কানে খাটো	কান-পাতলা	কান ভারী করা
কান দেওয়া	কান-কাটা	কান খাড়া করা

(ক) বিশ্বাসবাবু খুব ———— লোক, তাই অনেকেই ওঁর কাছে পরের নামে লাগায় ভাঙায়।

(খ) রামের নিন্দেমন্দ ক'রে মন্থরা কৈকেয়ীর ———— করত।

(গ) শত্রুর সাড়া পাওয়ার জন্যে খরগোশ ———— ক'রে রেখেছে।

(ঘ) পাগলের কথায় কেউ ———— না।

(ঙ) লোকটা এমন ———— যে ওর কোনো হায় লাজ নেই।

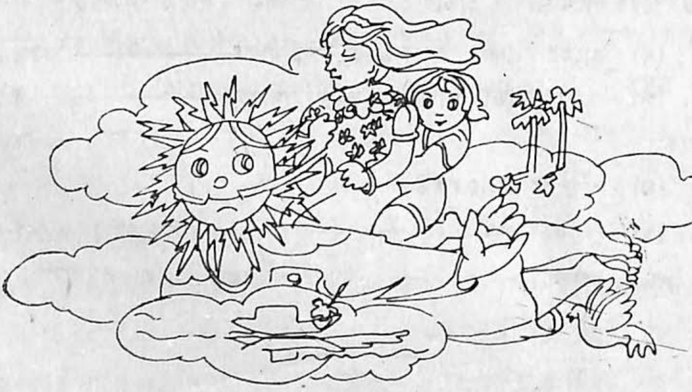
(চ) লোকটা ———— তুমি আরেকটু জোরে কথা বলো।

ভাই বোন

সামসুল হক

(১৯৩৬-): জন্ম—টেকপাঁজা, ২৪ পরগণা। পিতা আবদুল কাদের। কাকদ্বীপে থাকেন। শিক্ষকতা করেন, কবিতা লেখেন।

গগন ছিল নাম,
আমি কি জানতাম!
আর জানি না আকাশ নামে ছিল তার এক ভাই,
নীলিমা যে তাদেরই বোন জানতো কি সব্বাই?
গগন বলে — আমার ঘোড়ার নাম রেখেছি সূর্যি,
তার মত কি দুষ্টু ছেলে
রাজ্যি খুঁজে কোথাও মেলে?



মেঘের বনে কোথায় গেল — সকাল থেকে খুঁজছি।
আকাশ ছিল বেজায় খুশি, সেদিন চতুর্দশী —
পোষ-মানানো খরগোশ তার
গলায় দোলে ঝলমলে হার,
সারা উঠোন লাফিয়ে বেড়ায় — নাম দিয়েছি শশী।

মায়ের আঁচল শূন্য রেখে
অভিমানে চক্ষু ঢেকে
পালিয়ে গেছে যারা,
ঐ নীলিমার কোলের 'পরে
লুকোচুরি টক্কা-টরে
খেলছে হয়ে লক্ষ কোটি তারা।

অনুশীলনী

১। এ কবিতায় যে সংসারের কথা বলা হয়েছে, নিজের কথায় তার পরিচয় দাও।

২। ভাইবোন কে কে ? ঘোড়া কে ? খরগোশ কে ? কারা পালিয়েছে ?

৩। বাক্য তৈরি করো :

অভিমান, বেজায়, লুকোচুরি, টক্কা-টরে।

৪। কবিতাটির শেষ ৬টি লাইন পড়ে কী বুঝেছ লেখো।

মস্ত গাছ ও ছোট্ট পাখি

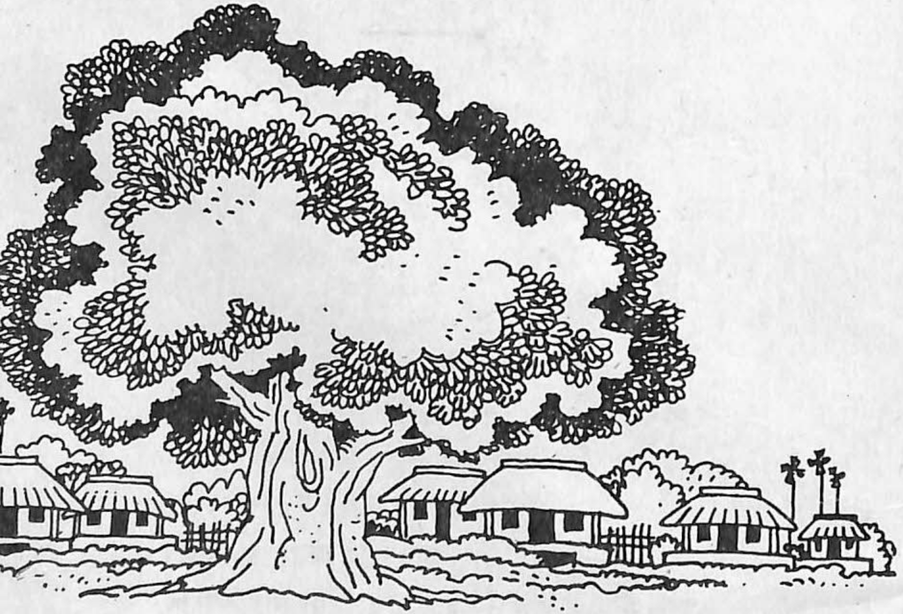
গৌরী ধর্মপাল

বি. এ. শিক্ষালাভের সময় ঈশান ছাত্রবৃত্তি পেয়েছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ডক্টরেট পেয়েছেন। লেডী ব্র্যাবোর্ন কলেজের অধ্যাপিকা। ছোটদের জন্য ছড়া ও গল্পলেখায় সিদ্ধহস্ত।

এক ছিল মস্ত উঁচু গাছ, আর তার চারপাশে ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি। বাড়ি-গুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গাছ ভাবত—

'ভয় ভাবনা নেইকো আমার কিছু।
সবার থেকে লম্বা আমি, সবার থেকে উঁচু ॥'

একদিন সকালবেলায় গাছ দেখল, সামনের জমিটায় অনেক লোহা-লক্কড়, যন্ত্রপাতি আর লোকজন। দেখতে দেখতে সেই লোহা-লক্কড়



দিয়ে লোকজনেরা এক প্রকাণ্ড লোহার থাম তৈরি ক'রে ফেলল। থামটা হল গাছের চেয়ে আরও অনেক অনেক উঁচু।

গাছের মনে খুব দুঃখু হল। তার ডাল বেয়ে পাতা বেয়ে টপ্‌টপ্‌ ক'রে জল পড়তে লাগল।

এক ছোট্ট পাখি সেখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। গাছকে কাঁদতে দেখে পাখি বলল—

'মিথ্যে কেন ফেলছ চোখের জল ?
ওর কি আছে তোমার মতো ডাল পাতা ফুল ফল ?'

গাছ বলল, তাই তো, ঠিক তো, সত্যি তো !

'এমনি বোকা আমি।
কাঁদতে কাঁদতে মরেই যেতাম, ভাগ্যি ছিলে তুমি ॥'

এই বলে, রোদের ফুলকাটা হাওয়ার রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে-টুছে গাছ মনের আনন্দে ডাল নাচাতে লাগল, আর ছোট্ট পাখি তার ওপর বসে বসে দোল খেতে লাগল।

অনুশীলনী

১। মূল লেখাটির ভাষায় বলো :

(ক) চারপাশের ছোট্ট ছোট্ট বাড়িগুলোর দিকে চেয়ে গাছ কী ভাবত ?

(খ) গাছকে কাঁদতে দেখে ছোট্ট পাখি তাকে কী বলল ?

(গ) সান্ত্বনা পেয়ে গাছ ছোট্ট পাখিটাকে কী বলল ?

২। বই না দেখে নিচের ফাঁক ভর্তি করো :

রোদের ———— হাওয়ার ———— দিয়ে চোখের জল ———— গাছ মনের আনন্দে ———— নাচাতে লাগল, আর ———— তার ওপর বসে বসে ———— খেতে লাগল।

৩। শুনে লেখো :

লোহালক্কড়, যন্ত্রপাতি, ফুলকাটা, রুমাল।

অন্ধকার নিবিয়ে দিয়ে

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

(১৯২০-): জন্ম—নলডাঙ্গা, যশোহর। খ্যাতনামা কবি ও সাংবাদিক। মসকোতে প্রগতি প্রকাশন সংস্থায় দীর্ঘদিন অনুবাদক ছিলেন। তাঁর লেখা কবিতার বই 'মনপবন', 'মেঘ বৃষ্টি ঝড়' উল্লেখযোগ্য।

(আমার দীপ দাদাইকে)

লোডশেডিং-এ ঘরে তেলের বাতি
উস্‌কে দিয়ে অন্ধকার জ্বেলে,
আলো ফিরলে দাদাই বলে, যাই
অন্ধকার নিবিয়ে দিয়ে আসি।
গোটা দিনটা রোদ্দুরের শহর
পিচ গলিয়ে আকাশ ধরে পথে,
বাতাস বেঁধে পাতার ঝাঁপিটিতে
রঙবেরঙে সাপ নাচায় গাছে।

লোডশেডিং থাক বা না-ই থাক
ঘরে বাইরে যদি অন্ধকার—
তখন আছে দাদাই। বলে, যাই
অন্ধকার নিবিয়ে দিয়ে আসি!

অনুশীলনী

১। কবিতাটিতে কার কথা বলা হচ্ছে? কবির সে কে হয়?

২। নিচের বাক্য দুটি শুনে তোমার মনে কী ছবি ফোটে নিজের কথায় বলো:

(ক) 'অন্ধকার নিবিয়ে দিয়ে আসি।'

(খ) 'পিচ গলিয়ে আকাশ ধরে পথে।'

৩। লোডশেডিং কী? লোডশেডিং কখনও কি তোমার ভালো লাগে? কেন?

স্বাবলম্বী

আবদুল আজীজ আল্‌-আমান

বসত—সোলেমানপুর, আমডাঙ্গা, ২৪ পরগণা। 'ছোটদের মহানবী', 'মক্কামদিনার পথে' বইএর লেখক।

ঈষৎ কোলাহল হতেই নবীজী উৎকর্ণ হলেন। একটা চাপা গুঞ্জন যেন। কী ব্যাপার!

একটা লোক ভিতরে আসতে চাইছে। বোধ হয় ভিখারী। একজন সাহাবী বললেন, একটা দিরহাম দিয়ে ছেড়ে দাও। অনর্থক ঝামেলা করবে ভিতরে গিয়ে।

নবীজী বোধহয় শুনেছিলেন কথাটা। বললেন, না — ভিক্ষে দিও না।

সে কী — ভিক্ষে দেব না! সাহাবীরা বিস্মিত হল।

ভিখারীকে ভিক্ষে দিতে মানা! এমন কথা কোনদিন ত শুনি নি নবীজীর মুখে।

নবীজী বললেন, ওকে আমার সামনে নিয়ে এস।

তাই হল। ভিখারী এসে বসল নবীজীর সামনে।

শুধোলেন নবীজী, কেন ভিক্ষে করছ?

ব্যথাভরা কণ্ঠে ভিখারী বলল, হুজুর — দু'দিন কিছু খেতে পাই নি। তাই এ কাজ করছি।

নবীজীও যেন একটু ব্যথিত হলেন। শান্ত কণ্ঠে শুধোলেন, কী আছে তোমার বাড়িতে?

একটা বাঁট-ভাঙা কুড়ুল।

আর কিছু না?

না।

৫/৬/

যাও, নিয়ে এসো কুড়ুলটা।

কিছু পরে লোকটা কুড়ুল নিয়ে ফিরে এল।

মানুষের নবী মুহম্মদ। নিজ হাতে একটা ডাল কেটে বাঁট লাগিয়ে দিলেন। তারপর সেই কুড়ুলটা ভিখারীকে দিয়ে বললেন, আজ থেকে বনে যাবে। বন থেকে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করবে। সামর্থ্য থাকতে কখনো মানুষের কাছে হাত পাত্‌তে নেই। পাপ হয়।

ভিখারী কুঠার নিয়ে বনে চলে গেল।

বেশ কিছু দিন পর।

সাহাবীদের নিয়ে নবীজী বসে ছিলেন। এমন সময় কুড়ুল হাতে সেই লোকটি এসে দাঁড়াল। তারপর উল্লসিত কণ্ঠে বলল, হুজুর, এখন আমার ভালোভাবেই দিন কাটছে। কোন কষ্ট নেই।

স্মিত হাসলেন নবীজী। বললেন, স্বাবলম্বীদের আল্লাহ্‌ ভালোবাসেন।

অনুশীলনী

১। গল্পটি থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায় ?

২। নিচের শব্দগুলি থেকে ঠিক অর্থের শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করো :

সহচর, প্রভু, পয়গম্বর, আরবদেশের মুদ্রা।

নবী ———————। সাহাবী ———————।

হুজুর ———————। দিরহাম ———————।

৩। গোড়ায় 'উৎ' আছে, এমন দশটি শব্দ লেখো।

৪। এক কথায় বলো :

(ক) শোনবার জন্য যে কান খাড়া ক'রে আছে ;

(খ) গুন্ গুন্ রব ;

(গ) শুধু শুধু ;

(ঘ) ছুরি দা ইত্যাদির হাতল ;

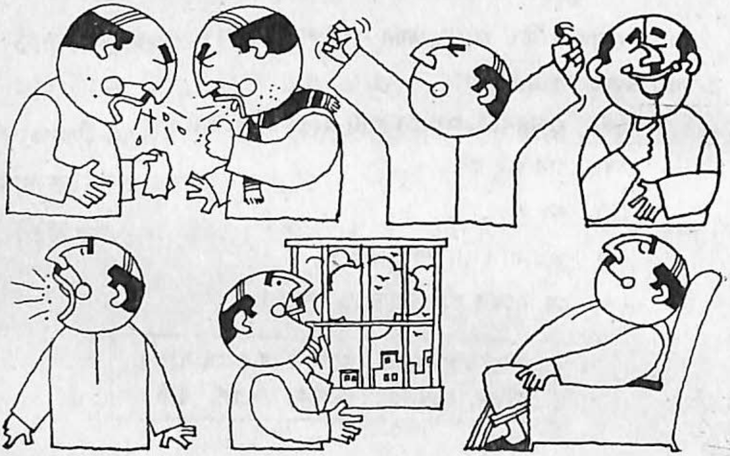
(ঙ) যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

নিচের শব্দগুলো থেকে উত্তর বেছে নাও : গুঞ্জন, স্বাবলম্বী, অনর্থক, উৎকর্ণ, বাঁট।

খুড়োর খাটুনি

নীরদ মুখোপাধ্যায়

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। ছোটদের জন্য ছড়া লিখতেন। দার্জিলিঙে দেহরক্ষা করেন।



রবিবার হাঁচির দিন
সোমবার কাশির
মঙ্গলবার আড়ামোড়ার
বুধবার হাসির।

হাই তুলতে কেটে যায়
বিষ্যুৎবারের বেলা
শুক্রবারে সারাদিন
আকাশ দেখার পালা।

ছ'টা দিনের খাটুনিতে
শরীর কাহিল হলে
শনিবারটা ছুটি নেন
জিরিয়ে নেবেন ব'লে ॥

অনুশীলনী

১। সপ্তাহের সাতদিন খুড়োর কীভাবে কাটে ?

২। কবিতাটি মুখস্থ বলো।

৩। সমার্থক শব্দ লেখো :

দিন, আকাশ, পালা, খাটুনি, দেখা, শরীর, ছুটি, কাহিল, জিরিয়ে।



কামিনী রায়

শৈলেন কুমার দত্ত

(১৯৪০-　　)ঃ জন্ম—শ্রীরামপুর, হুগলী। ছাত্র বয়স থেকেই রম্যরচনা লেখেন। সহজ ভাষায় মনীষীদের জীবনী লেখার জন্য তিনি প্রশংসা পেয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে কবি কামিনী রায়ের (১৮৬৪-১৯৩৩) একটি বিশিষ্ট আসন আছে। নির্মল স্বচ্ছ চিন্তাধারা, সুস্থ কল্পনাশক্তি এবং স্বচ্ছন্দ প্রকাশভঙ্গি তাঁর রচনাবলীকে জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী প্রতিষ্ঠাও দান করেছিল। কবি হিসেবে তিনি যেমন উচ্চশ্রেণীর ছিলেন, মহিলা হিসেবেও তেমনি ছিলেন অগ্রগণ্যা। অথচ আক্ষেপের কথা — 'সুখ', 'কামনা', 'মা আমার' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা ছাড়া তাঁর কাব্যসম্ভার পরবর্তীকালে খুব বেশি সমাদর পায় নি।

কামিনী রায় প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে কয়জন মহিলা-কবি বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, কবি কামিনী রায়ের স্থান তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।

এই শ্রেষ্ঠত্বের পিছনে কতকগুলি সামাজিক কারণ ছিল। কামিনী রায়ের পিতা চণ্ডীচরণ সেন সাহিত্য ও দর্শনের একজন একনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। গ্রন্থকার হিসেবেও তাঁর সুখ্যাতি ছিল। কবির স্বামী কেদার নাথ রায় ছিলেন সেকালের একজন নামজাদা সিভিলিয়ান। শিক্ষা, দীক্ষা, মর্যাদাবোধ জীবন-গঠনে যতটা সহায়তা করে, কামিনী রায়

আশৈশব তা পেয়েছিলেন। ছাত্রী হিসেবেও তিনি মেধাবী ছিলেন। পিতার ধর্মপ্রাণতা এবং দেশপ্রেম কন্যার মধ্যে কতটা সঞ্জীবিত হয়েছিল, তার প্রমাণ 'সুখ' কবিতাটি। এই কবিতাটি কবি মাত্র ষোল বছর বয়সে রচনা করেন।

পরবর্তীকালে স্বামীর সঙ্গে বহু স্থানে ঘুরে তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেন; এসব অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যকে খুব বেশি প্রভাবিত না করলেও, তাঁর জীবনের সঞ্চয় বাড়িয়েছিল।

অনুশীলনী

১। নিজের ভাষায় কবি কামিনী রায়ের জীবনকথা বলো।

২। কামিনী রায়ের যে কোনো একটি কবিতা খুঁজে নিয়ে, তা থেকে তোমার পছন্দমত কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করো।

৩। জেনে নিয়ে মানে লেখো :

স্বচ্ছ, সম্ভার, আক্ষেপ, সিভিলিয়ান, মেধাবী, সমাদর।

৪। বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

সুস্থ, সুখ্যাতি, স্থায়ী, সঞ্চয়, উচ্চ, নির্মল।

রাজার ছেলে

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯০৪-   ): জন্ম—হুগলী। কবি ও চিত্রশিল্পী। রাজনৈতিক সংগ্রামে কারাবরণ করেছেন। তাঁর 'মুক্তিপথে' কাব্যগ্রন্থ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর শিক্ষক ছিলেন। ছোটদের জন্য অনেক কবিতা ও দেশীয় খেলার বিবরণ লিখেছেন।

কীকটপুরের বিকট রাজার বয়স হল ষাট ;
রাজকুমারে বুঝিয়ে দিয়ে এবার রাজ্যপাট
যাবেন তিনি বানপ্রস্থে স্থির করলেন মনে,
সাধন-ভজন নিয়ে রবেন মুনির তপোবনে।
রাজার ছেলে অরুণকুমার বয়স তাহার কুড়ি,
রূপে গুণে খেলাধুলায় নেইকো তাহার জুড়ি।
জিন-লাগামের ধার ধারে না — পাগলা ঘোড়ায় চড়ে,
একলা ঢুকে গহন বনে সিংহ শিকার করে,



বানের জলে ময়ূরপঙ্খী নৌকোতে বায় দাঁড় ;
রাজ্যশাসন শিখতে কেবল নেইকো তাহার চাড়।
বটের ছায়ায় বাজায় বাঁশি রাখাল-ছেলের সাথে,
চাঁদের মায়ায় পাগল হয়ে ঘুমোয় নাকো রাতে ;
ছন্দ গেঁথে পদ্য লেখে — চলছে কানাঘুষো ;
খামখেয়ালির শেষ মেলে না ; একটি ত নয় দুশো।

অনুশীলনী

১। কীকটপুরের রাজা আর রাজকুমারের নাম কী ? কার কত বয়স ? রাজকুমারের বিষয়ে কিছু বলো।

২। নিচের জোড়া-কথার বাকি অর্ধেক কী ?

———পাট। সাধন———। খেলা———।

———লাগাম। কানা———। খাম———।

৩। শুনে বানান লেখো :

বানপ্রস্থ, ময়ূরপঙ্খী, তপোবন, কীকটপুর।

৪। কবিতাটিতে মোট কটি লাইন আছে ?

চাকার গল্প

পার্থসারথি চক্রবর্তী

কৃষ্ণনগরের সন্তান। বিজ্ঞানে পি-এইচ. ডি. লাভ ক'রে বিজ্ঞানবিষয়ক রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চপদে কর্মরত। পিতা সাহিত্যিক ননীগোপাল চক্রবর্তী।

আসলে চাকা আবিষ্কারের ফলেই মানুষের সভ্যতা অনেকখানি এগিয়ে যেতে পেরেছে। বলা যেতে পারে, চাকা তৈরিই হচ্ছে মানুষের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং মহান্ আবিষ্কার। আজ যদি চাকা আবিষ্কার না হত তাহলে অবস্থাটা কীরকম দাঁড়াত সেটা একবার ভেবে দেখা। চাকা না থাকলে গরুর গাড়ি, ট্রাম, বাস, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন কিছুই চলত না। আর এই যে এখন আমরা হুস্ ক'রে হিল্লি-দিল্লি চলে যাচ্ছি, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের সঙ্গে কত সহজেই যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলেছি — সেটা তত সহজ হত না। সামান্য কার একটা চাকা কীভাবে আমাদের সভ্যতাকে ঠেলা দিয়ে কতখানি এগিয়ে নিয়ে গেছে, তা ভাবলে সত্যি অবাক হয়ে যেতে হয়!

চাকা ঘুরতে পারে বলেই আজ আমাদের যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার এত সুবিধা হয়েছে। এছাড়া প্রাচীন কালের পাথর ও কাঠের চাকার সঙ্গে আধুনিক চাকার কোনও তুলনা হয় না। অন্যান্য বহু জিনিসের মতো চাকারও বিবর্তন হয়েছে।

প্রাচীনকালে মানুষ যখন পাথরের গায়ে খোদাই-করা-মূর্তি অথবা ঐ ধরনের বিশাল কোনো পাথরের টুকরো কোথাও সরাতে চাইত, তখন সেগুলো কাঠের রোলারের ওপর চাপিয়ে ঠেলে নিয়ে যেত। এতে মানুষের কষ্ট হত খুব, কিন্তু কী আর করা যাবে, তখন তো আর চাকার আবিষ্কার হয়নি!

মিশরীয়দের মতো গ্রীক যোদ্ধারাও তাঁদের রথে স্পোকওয়ালা বেড়-দেওয়া কাঠের চাকা ব্যবহার করতেন। যে বিরাট কাঠের তৈরি ঘোড়া যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়ে অডিসেয়াস ও তাঁর সহকর্মীরা ট্রয়ের পতন ঘটালেন, তার চাকাও কাঠের তৈরি।

আগেকার দিনে রথের চাকা সাধারণত ঘোড়াতেই টানত। যখন যুদ্ধের প্রয়োজন থাকত না, তখন অবশ্য বলদ দিয়ে রথ টানানো হত। এখনও পৃথিবীর নানা জায়গায় গরুর গাড়ির প্রচলন আছে।

একজন ফরাসী ভদ্রলোক, নাম কুমতে দে সিভরাক, প্রথম দু'চাকার সাইকেল তৈরি করেন। সেই সাইকেল দেখলে এখন তোমাদের হাসি পাবে। এতে না ছিল গীয়ার, না ছিল প্যাডাল বা স্টীয়ারিং। মাটিতে পা দিয়ে ঠেলে সেই সাইকেলকে চালাতে হত। কির্ক প্যাট্রিক ম্যাকমিলান নামে এক স্কটিশ কামার প্রথম প্যাডাল লাগিয়ে সাইকেলকে ঠেলার



কথা ভাবেন। এর পর মেয়ার ও লউসন এক মজার সাইকেল তৈরি করলেন। চেন লাগানো সেই সাইকেলের সামনের চাকাটা পিছনের চাকার চাইতে বেশ বড় ছিল। ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত সেই সাইকেল ছিল খুবই জনপ্রিয়।

১৭৬৯ সালে জেম্‌স্‌ ওয়াট প্রথম স্টীম এন্‌জিন তৈরি করেন।

রিচার্ড ট্রিভিথিক আবিষ্কার করলেন উচ্চ-চাপ-যুক্ত স্টীম এন্‌জিন। রিচার্ডের এন্‌জিন ওয়াটের এন্‌জিনের চেয়ে ছোট ছিল এবং রেল-লাইনের ওপর দিয়ে খুব সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে পারত। রিচার্ডের এই মজার এন্‌জিন — 'কে আমাকে ধরতে পারে' (ক্যাচ মি হু ক্যান) ঘণ্টায় ১২ মাইল বেগে ছুটে সবাইকে অবাক ক'রে দিয়েছিল। এটার ওজন ছিল মাত্র আট টন।

রেলপথের উন্নতির জন্যে যে-ভদ্রলোক সব চাইতে বেশি ধন্যবাদ পাবেন, তাঁর নাম জর্জ স্টিফেনসন। তিনি তাঁর প্রথম এন্‌জিন 'ব্লুচার' তৈরি করেছিলেন ১৮১৪ সালে। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথম যাত্রী- ও কয়লাবাহী রেলগাড়ি ছুটল স্টকটন থেকে ডারলিংটন পর্যন্ত। এরপর স্টিফেনসন আর তাঁর ছেলে এন্‌জিন তৈরি করার জন্যে একটা কারখানা খুললেন। এই কারখানায় তৈরি 'রকেট' এন্‌জিন ঘণ্টায় ১৪ মাইল বেগে ছুটে সবাইকে চমকে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই 'রকেট' লিভারপুল ও ম্যান্‌চেস্টার রেলওয়ে আয়োজিত এন্‌জিনের দৌড় প্রতিযোগিতায় সবাইকে টেক্কা দিয়ে প্রথম স্থান দখল ক'রে ৫০০ পাউণ্ড জিতে নিল।

আমাদের বাংলাদেশে প্রথম রেলগাড়ি চলে ১৮৫৪ সালে। এই গাড়ি চলেছিল হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত। তখন দূর থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই গাড়ি দেখে নাচত আর বলত—

"ধায় গাড়ি ধূম ছাড়ি
ধায় শত পায়
ঝড় গতি জোর অতি
দুনিয়া কাঁপায়!
উঁকি মেরে ঝাত ক'রে
সরে যায় সাত ক'রে
দেখি ঘাড় কাত ক'রে — নাই, আর নাই!
ধায় গাড়ি ছোটে — বাই বাই।"

চাকা আবিষ্কারের প্রায় ৫,০০০ বছর পরে বাতাস-ভরা টিউবের ব্যবহার শুরু হয়েছে। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে জন বয়েড ডানলপ প্রথম ভিতর-ফাঁপা টায়ার ও বাতাস-ভরা টিউব আবিষ্কার করেন। একটা কাঠের গোল চাকায় বাতাস-ভরা টিউব লাগিয়ে দেখা গেল সেটা বেশি জোরে ছুটতে পারে। পরে ডানলপ তাঁর এই আবিষ্কার পেটেণ্ট করেন।

চাকার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে তার গতিবেগও বেড়ে চলল।

অনুশীলনী

১। চাকা জিনিসটা সম্পর্কে তোমার কী ধারণা ?

২। প্রাচীন যুগে প্রথম কাঠের চাকা কারা ব্যবহার করেছিলেন ?

৩। খ্রীস্টের জন্মের আনুমানিক কত বছর আগে চাকার ব্যবহার শুরু হয়েছিল ?

৪। (ক) মহাভারতে কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের হাতে নিহত হবার সময়ে চাকার কী ভূমিকা ছিল ?

(খ) রথে চড়ে সেই যুদ্ধের বিবরণ পাচটি বাক্যের সাহায্যে লেখো।

৫। 'ঘোড়ার গাড়ির পরে এল চাকার ঘোড়া' — সেই 'চাকার ঘোড়া' জিনিসটা কী ?

৬। বাক্য তৈরি করো :

আবিষ্কার, হিল্লি-দিল্লি, গোলাকার, প্রচলন, শোভাযাত্রা।

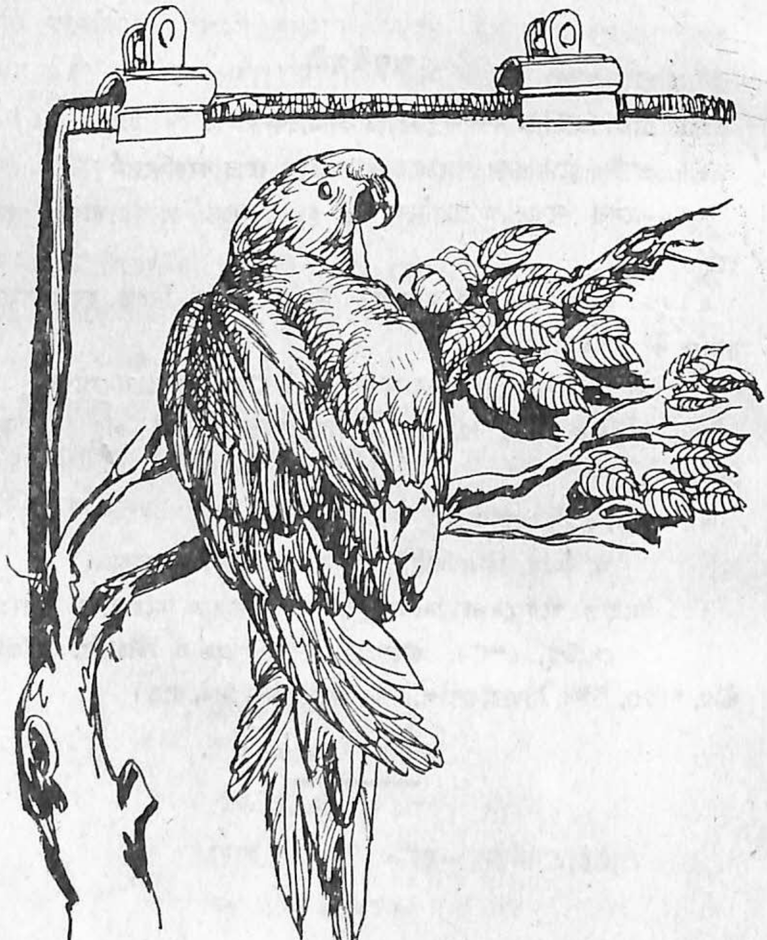
৭। ইংরেজি থেকে নেওয়া নিচের শব্দগুলির মানে বুঝে নিয়ে বাংলা বলো :

পেটেণ্ট, স্পোক, এরোপ্লেন, গীয়ার, প্যাডাল, স্টীয়ারিং, এন্‌জিন, স্টীম, পাউণ্ড, টিউব, টায়ার, পেট্রল, সাইকেল, মোটর, ট্রাম, বাস।

আতা চোরা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

(১৯৩৩-   ): জন্ম—বহড়ু, ২৪ পরগণা। সাহিত্য আকাদেমি থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত জনপ্রিয় কবি। আনন্দবাজার পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। কবিতার বই, ছড়ার বই, উপন্যাস লিখেছেন।



আতাচোরা পাখি রে
কোন্ তুলিতে আঁকি রে
— হলুদ ?
বাঁশবাগানে যাইনে
ফুল তুলিতে পাইনে
—কলুদ
হলুদ বনের কলুদ ফুল
বটের শিরা জবার মূল
পাইতে
দুধের পাহাড় কুলের বন
পেরিয়ে গিরি গোবর্ধন
নাইতে
ঝুম্‌রি তিলাইয়ার কাছে
যেই নদীটি থমকে আছে
তাইতে
আতাচোরা পাখি রে
কোন্ তুলিতে আঁকি রে
— হলুদ ?

অনুশীলনী

১। পাখিটির নাম 'আতাচোরা' কেন ?

২। প্রথম বারো লাইন মুখস্থ বলো।

৩। কলুদ, তিলাইয়া, আতা, গোবর্ধন — কোন্‌টা কী ?

— পাহাড়। — ফল। — বাঁধ। — ফুল।

৪। বটের শিরা, দুধের পাহাড়, আতাচোরা।

— এই কথাগুলো শুনে কী মনে হয় ?

জানে শুধু মা

কৃষ্ণদয়াল বসু

(১৮৯৭-১৯৭২): জন্ম—শিকলা, টাঙ্গাইল। মিত্র ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা করতেন। ছোটদের জন্য অনেক কবিতা গল্প লিখেছেন।

ছোট্ট এতটুকু গল্প। তবু ভোলা যায় না কিছুতেই। একবার শুনলে মনে ছাপ রেখে যায় চিরদিনের মতো।

ঘটনাটি ঘটেছিল স্কট্ল্যাণ্ডে। সেখানে পাথরের খনি আছে অনেক। তখনকার দিনে কি-ক'রে পাহাড় ধ্বসিয়ে দিয়ে পাথর সংগ্রহ করা হত জানো? পাহাড়ের গায়ে প্রকাণ্ড এক গর্ত ক'রে তাতে বারুদ পূরে' তার সঙ্গে একটা পল্‌তে জুড়ে দেওয়া হত; তারপর, সব যখন প্রস্তুত, তখন বিপদের সঙ্কেত জানিয়ে ঘণ্টা উঠত বেজে, অম্‌নি পল্‌তেয় আগুন ধরিয়ে দিয়ে লোকজন সব স'রে পড়ত। খানিকটা দূরে একটা নিরাপদ জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে তারা প্রতিমুহূর্তে বিস্ফোরণের প্রতীক্ষা করত।

একদিন এই সময়ে এক অঘটন ঘটল। পল্‌তেয় আগুন জ্বেলে দিয়ে যখন লোকজন সবাই স'রে পড়েছে, হঠাৎ দেখা গেল বছর-তিনেকের ছোট্ট একটি ছেলে সকলের চোখ এড়িয়ে কখন সেই পাহাড়ের ধারে খোলা জায়গাটার উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিতান্তই অবোধ সরল এক শিশু। সে জানে না, ভাবতেও পারেনি, মৃত্যু একেবারে তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে! যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি বীভৎস সেই মৃত্যু চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই তাকে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে যাবে।

এখন উপায়? কেমন ক'রে বাঁচানো যায় ঐ নির্বোধ নির্ভয় অসহায় শিশুকে? লোকজন সেখানে যারা ছিল তারা কী যে করবে

কিছু ভেবে না পেয়ে কেবল মহাব্যস্ত হয়ে হাতমুখ নেড়ে সবাই একসঙ্গে চিৎকার ক'রে ওকে ডাকতে লাগল, 'ওরে আয় আয়, ছুটে পালিয়ে আয় শীগগির !—'

কিন্তু কে কার কথা শোনে ! ছেলেটি যেখানে ছিল সেইখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এদের পানে চেয়ে আছে। এতগুলি লোকের ঐ বিকট চিৎকার শুনে আর অমন-সব অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী দেখে তার ভারি মজা লাগছে; অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে,—তার নড়বার নামও নেই। এদিকে এদের একটি লোকেরও এমন সাহস নেই যে ছুটে গিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে আসে। কে জানে, যদি সেই মুহূর্তেই বিস্ফোরণ হয় তাহলেই তো সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ !

ঠিক এমনি সময়ে ঐ লোকগুলির মাঝখানে ছুটে এসে দাঁড়াল ছেলেটির মা। একবার সে চেয়ে দেখল। ব্যাপারটা বুঝে নিতে তার তিলার্ধ দেরি হল না। তখন সহসা সে এমন একটা কাণ্ড ক'রে বসল যা কেবল মায়েরাই পারে। জগতে এক মা ছাড়া এ কৌশল আর কারো জানবার কথাও নয়।

কী করল সে ? ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল ?

না। ছেলে ভয় পাবে যে !

তবে কি সে নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে ছেলের কাছেই ছুটে গেল ?

না, তাও নয়। ছেলেও ছুটে পালাতে গিয়ে মৃত্যুর মুখেই ঝাঁপিয়ে পড়বে তাহলে।

তাই, এসব কিছুই সে করল না। মুখে একটি কথাও না ব'লে, যেখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানেই মাটিতে হাঁটু গেড়ে ব'সে প'ড়ে, সে কেবল তার দু'খানি হাত ব্যাকুল আগ্রহে বাড়িয়ে দিল ছেলেটির পানে।

এ ইঙ্গিত ব্যর্থ হল না, এই নীরব আকুল আহ্বান। মায়ের হৃদয়ে সন্তানের জন্যে চিরদিন যে-অমৃত লুকানো থাকে, এ যে তারই অমোঘ আকর্ষণ। আর কি ছেলে দূরে থাকতে পারে ? যেখানে, যতদূরেই সে থাক্‌—স্নেহের ঐ বাঁধনে ধরা দিতে তাকে যে আসতেই হবে ছুটে !



সহসা প্রচণ্ড শব্দে ভীষণ এক বিস্ফোরণ হয়ে আকাশ-বাতাস মাটি থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠল।

শিশুটি কোথায়?

সে তখন ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে— মৃত্যুর মুখে নয়— তার মায়ের বুকে!

অনুশীলনী

১। কাহিনীটি কেমন লাগল তা অন্তত পাঁচটি বাক্য লিখে বোঝাও।

২। মা কী ভাবে তাঁর শিশুটিকে রক্ষা করলেন?

৩। স্কটল্যাণ্ডের এই মা কি যে কোনো দেশের মা হতে পারেন? কেন?

৪। পাথর সংগ্রহ করার জন্যে কী ভাবে পাহাড় ধ্বসানো হত?

৫। বাক্য তৈরি করো:

বিস্ফোরণ, সঙ্কেত, প্রতীক্ষা, নিশ্চিহ্ন, নির্বোধ, নির্ভয়, হাঁটু গেড়ে।

রাখাল ছেলে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৯৮-১৯৭১): জন্ম—লাভপুর, বীরভূম। পিতা হরিদাস। ইংরেজ আমলে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করায় তাঁর কলেজের শিক্ষা শেষ হয়নি। বহু ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন।

রাখাল ছেলে বাবরী চুলে লাল পাগুড়ি বেঁধে মাথায়
তরল বাঁশের বংশীখানা হাতে নিয়ে
এলো একদিন কলিকাতায়।

গড়ের মাঠে দুপুরবেলায় — গাছের তলায়
মিষ্টি ছায়ায় —
ওই বাঁশীতে তুলবে তান, লোকেরা সব
শুনে সে গান ভুলবে মায়ায়।



রাখাল ছেলে এসেছিল
বাঁশীখানিও বাজিয়েছিল
সুর যে তারই ভেসে বেড়ায় হাওয়ায় হাওয়ায়।
নেইকো শুধু রাখাল ছেলে
শুধায় সবে — কোথায় গেলে
মিলবে তারে বলতে পারো — ? জবাব তাহার
হারিয়ে গেছে হায় রে হায়।
হায় রে হায়, হায় রে হায়॥

অনুশীলনী

১। (ক) গড়ের মাঠে যখন পাতাল রেলের কাজ শুরু হয়, তখন যারা প্রথম গাঁ থেকে এসেছিল, তাদের দেখলে 'রাখাল ছেলে'র কোন্ কোন্ লাইন তোমার মনে পড়ে যেত?

(খ) আস্তানা ছেড়ে তারা চলে যাবার পর তাদের কথা তোমার মনে পড়ে?

২। নিচের শব্দগুচ্ছে কোনো ভুল আছে কি? কেন খট্‌কা লাগে? কেন ভুল নয়?

তরল বাঁশ, মিষ্টি ছায়া।

৩। শেষ আট লাইন মুখস্থ বলো।

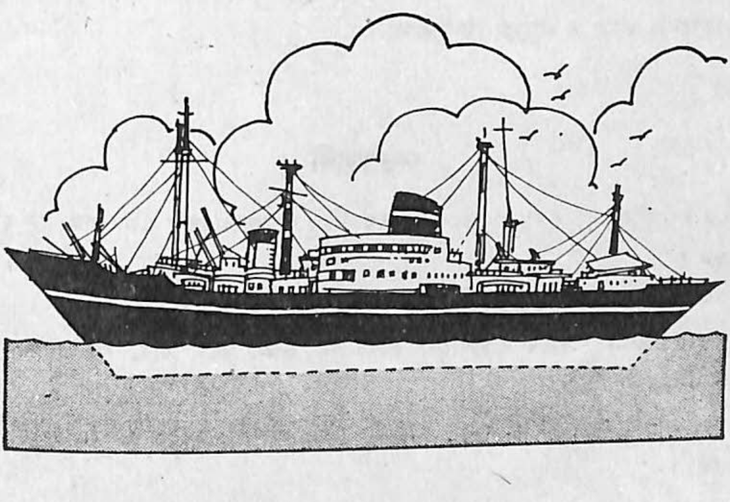
জাহাজ কেন ভাসে

দেবীদাস মজুমদার

লোহার তৈরি একটা জাহাজ জলে ভাসে কেমন করে, তা বলতে পার ? তার কারণ, জলের (বা যে-কোনো তরল পদার্থের) মধ্যে একটা জিনিস ডোবালে সেই জিনিসটার ওজন কমে যায়—অন্তত মনে হয় কমে গেল।

জলের নিচে ডুব দিয়ে একটা থান ইঁট তোলবার চেষ্টা করো, দেখবে ইঁটটা কত হালকা লাগছে। কিন্তু কেন বলো তো ?

তার কারণ জলের ঐ চাপ ঃ জল নিচের দিক থেকে ইঁটটাকে ওপর দিকে চাপ দিচ্ছে আর তাই জলের তলায় ডুব দিয়ে যখন তুমি ইঁটটা তুলছ, তখন তো শুধু নিজের গায়ের জোরেই তুলছ না — নিচের দিক থেকে জলের চাপও ইঁটটাকে ওপর দিকে ঠেলতে ঠেলতে তোমাকে



সাহায্য করছে যে! তাই তোমার মনে হচ্ছে, ইঁটটা হালকা হয়ে গেল।

তাই জলের নিচে একটা জিনিস ডোবালে জিনিসটার ওজন কমে যায়। কিন্তু কতখানি কমে? তারও হিসেব আছে। একটা কিছু জলের মধ্যে পুরোপুরি (বা খানিকটা) ডোবালে পর সেই জিনিসটা জলের মধ্যে খানিকটা জায়গা জুড়ে থাকবে তো। সেই জায়গায় যতটা জল ধরত, সেই জলের একটা ওজনও থাকবে নিশ্চয়ই। তাহলে, ওই পুরো জিনিসটার ওজন থেকে জলের এই ওজনটা বাদ দিয়ে দাও, বেরিয়ে যাবে জিনিসটার ওজন কমে কতটা হল। এই নিয়মটা প্রথম বার করেন গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস।

আর্কিমিডিসের এই নিয়ম থেকেই বোঝা যায় জাহাজ কেন ভাসে। জাহাজের যে অংশটা জলের নিচে ডুবে থাকে সেটা ফাঁপা, তাই সেটার ওজন খুবই কম। কিন্তু তার আয়তন বিশাল। কাজেই সেই আয়তনের জলের ওজন গোটা জাহাজটার ওজনের সমান হয়, ফলে জাহাজটা তার নিজের সবটুকু ওজন খুইয়ে বসে। তাই জাহাজটা ভাসতে থাকে, ডোবে না।

অনুশীলনী

১। জলে বা কোনো তরল পদার্থে কিছু ডোবালে তার ওজন কম মনে হয় কেন?

২। জলে ডোবানো কোনও জিনিসের ওজন কতটা কমে?

৩। তরল পদার্থে ডোবানো জিনিসের ওজন কমে যায়, কে এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করেছিলেন?

৪। লোহার তৈরি ভারী জাহাজও কেন জলে ভাসে, নিজের কথায় বুঝিয়ে বলো।

৫। মানে বলো:

পদার্থ, অন্তত, আয়তন, ওজন, খোয়ানো।

৬। নিচের ক্রিয়াপদগুলির ক্ষেত্রবিশেষে **বর্তমান, অতীত আর ভবিষ্যৎ রূপ** বসিয়ে ফাঁকগুলি পূরণ করো :

বর্তমান	অতীত	ভবিষ্যৎ
ভাসে	________	________
________	গেল	________
________	________	থাকবে
কমে	________	________
ডোবে	________	________
________	হল	________

হরিতকী

কবিরুল ইসলাম

(১৯৩২-   ): বীরভূমের সন্তান। উচ্চশিক্ষা লাভ ক'রে কলেজে অধ্যাপনা করছেন। পত্রপত্রিকায় কবিতা লেখেন।

মাঝে-মধ্যে ট্রেনে চড়ে,
চড়ে গরুর গাড়ি
সিউড়ি থেকে সকালে যাই
দূর গ্রামের বাড়ি।



তিনটি গ্রাম ত্রিভুজ যেন
একটু ধারে-কাছে :
আমলা আছে, বহেড়া আছে,
হতুকিও আছে।

প্রথম দু'গ্রাম স্বনামে বহাল,
তৃতীয় হরিওকা—
হস্তুকির এই রূপান্তরে
নাচছে বড় খোকা।

অনুশীলনী

১। একটির নাম আমলা, একটির নাম বহেড়া, ত্রিভুজের বাকি গ্রামটির নাম কী? ত্রিফলার একটির নাম আমলকী, একটির নাম বহেড়া, বাকি ফলটির কী নাম?

২। সিউড়ি কোন্ জেলায়? সিউড়িতে ট্রেন থেকে নেমে দূর গ্রামে কিসে ক'রে যাবে?

৩। 'হরিওকা' কার লেখা? কবিতাটি মুখস্থ লেখো।

৪। নিচের একেকটি শব্দ জুড়ে একেকটি বাক্য লেখো:

মাঝে-মধ্যে, ত্রিভুজ, স্বনাম, বহাল, রূপান্তর।

ময়না দোকান যায় না

আশাপূর্ণা দেবী

(১৯০৯-): জন্ম—পটলডাঙ্গা, কলকাতা। পিতা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, স্বামী ৺কালিদাস গুপ্ত। বাড়িতে শিক্ষালাভ ক'রে তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। বহু গল্প উপন্যাস লিখেছেন, পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর রচনায় ঘরোয়া জীবনের কথা সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে।

ময়না দোকান যায় না,
তবুও করে বায়না
চুল বাঁধবে, মুখ মাজবে, চাই একটা আয়না।
ক্রীম-পাউডার মাখবে
তেল-চিরুনি রাখবে
চাই একটা লম্বা টেবিল-আয়না।



ছুঁচলো-জুতো নাক তুলে তার বললে—
ঠোঁট বাঁকিয়ে ময়না কোথায় চললে ?
আমায় প'রে নাও না

দোকানে চলে যাও না

নইলে বাপু কিচ্ছু পাওয়া যায় না।

তেল-চিরুনি আয়না টেবিল

কিচ্ছু পাওয়া যায় না।

অনুশীলনী

১। ময়নার কোন্ কোন্ জিনিসের বায়না ?

২। ময়নাকে দোকানে যেতে বলল কে এবং কেন ?

৩। নিজে নিজে নিচের শব্দগুলোর সঙ্গে সমান অক্ষরের মিল দাও ঃ

ময়না, সাজবে, দোকানে, ঠোঁট।

৪। ছুঁচলো-জুতো কী বলল, কবিতাটির ভাষায় আগাগোড়া বলো।

পরীর দেশে

(নাটিকা)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৯৯-১৯৭০) : জন্ম—জৌনপুর, উত্তরপ্রদেশ। পিতা তারাভূষণ। কিছুকাল ওকালতি করেন, তারপর চলচ্চিত্র জগতে যুক্ত হন। রহস্যকাহিনী, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প লিখে জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

খোকা ॥ প আর রয়ে দীর্ঘঈ পরী, প আর রয়ে দীর্ঘঈ পরী — নাঃ, পড়তে ভালো লাগছে না। (বই ফেলিয়া দিল) কী সুন্দর সমুদ্রের জল নাচছে। আর ঐ যে দূরে — অনেক দূরে জলের মাঝখানে কালো পাহাড়ের মত দেখা যাচ্ছে — ওটা নিশ্চয় দ্বীপ। আমি যদি ওখানে যেতে পারতুম, কেমন মজা হত। (দূরে সঙ্গীত) ও কী! একটা মেয়ে গান গাইতে-গাইতে আসছে।



পরী ॥ (গান)

নীল সাগর ঘেরা রাঙা পরীর দেশ
সেথা নেইকো দুঃখ ক্লেশ
উপকূলে হাসি খেলা
ঝিনুক নিয়ে সারা বেলা
সারানিশি ঘুমের মাঝে স্বপন-আবেশ।

খোকা ॥ তুমি কে?

পরী ॥ আমি পরী—আমার নাম আশা-পরী। তুমি আমাকে পরী পরী বলে ডাকছিলে, তাই এসেছি।

খোকা ॥ ও তো আমি পড়া মুখস্থ করছিলুম। তুমি কোথা থেকে এলে?

পরী ॥ ঐ পরীর দ্বীপ থেকে। ওখানে আমার মত আরও অনেক পরী আছে—হাসি-পরী, খেলা-পরী, তৃপ্তি-পরী। তুমি ওখানে যাবে?

খোকা ॥ যাব। কিন্তু কী ক'রে যাব? আমার তো তোমার মত পাখা নেই।

পরী ॥ যদি তোমার সত্যিই যাবার ইচ্ছে থাকে, ভোমরা-বাহনকে ডাকো, সে এসে তোমাকে পিঠে ক'রে নিয়ে যাবে।

খোকা ॥ ভোমরা-বাহন ভোমরা-বাহন, তুমি এসে আমাকে পিঠে ক'রে পরীর দেশে নিয়ে যাও—কৈ আসছে না তো!

পরী ॥ ও রকম ক'রে ডাকলে আসবে না। আচ্ছা, আমি ডেকে দিচ্ছি—

আয় রে আয় ভোমরা-বাহন
কড়ি দেব তোকে সাত কাহন।
খেতে দেব চাঁপা ফুলের রস
তুই কি হবি আমার রথ?

(ভোঁ শব্দ)

ভোমরা ॥ কী চাও ?

খোকা ॥ আমি পরীর দেশে যাব, তুমি নিয়ে যাবে ?

ভোমরা ॥ যাব। কিন্তু একটা কথা আছে। আমার পিঠে চড়বার পর তুমি যদি পিছু ফিরে চাও তাহলে আমি তোমাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দেব — হাঙ্গরে কুমিরে তোমাকে খেয়ে ফেলবে।

খোকা ॥ না — আমি পিছু ফিরে চাইব না।

পরী ॥ বাড়ির জন্যে তোমার মন কেমন করবে না ?

খোকা ॥ নাঃ।

ভোমরা ॥ আর একটা কথা। পরী-রাজ্যের সিংদরজায় দুটো রাক্ষস পাহারা দেয়। তাদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। তুমি পারবে ?

খোকা ॥ খুব পারব! আমার একটা টিনের তলোয়ার আছে। তাই দিয়ে রাক্ষসের মুণ্ডু কেটে ফেলব।

ভোমরা ॥ আচ্ছা, এস তাহলে আমার পিঠে!

খোকা ॥ এই যে। এবার চল—

(ভোঁ শব্দ)

পরী ॥ খোকা, ফিরে চাও — ফিরে চাও—

খোকা ॥ না, আমি ফিরে চাইব না। ফিরে চাইলে ফেলে দেবে।— ভোমরা-বাহন, আরও জোরে চল— (জোরে ভোঁ শব্দ)

॥ ২ ॥

(ভোঁ শব্দ)

রাক্ষস ॥ (দূর হইতে) কে রে! কে ভোমরার পিঠে চড়ে এদিকে আসছে ? মরবার ইচ্ছে হয়েছে!

ভোমরা ॥ খোকা, ঐ রাক্ষস উড়তে-উড়তে আসছে। নাও, এবার যুদ্ধ করো!

খোকা ॥ আচ্ছা, তুমিও ওর দিকে এগিয়ে চল ভোমরা-বাহন।

রাক্ষসটা মস্ত বড়। (ভোঁ শব্দ) কী আশ্চর্য, যতই কাছে যাচ্ছি রাক্ষসটা ততই ছোট হয়ে যাচ্ছে— এ যে একরত্তি রাক্ষস! কিন্তু কী বিচ্ছিরি চেহারা — দাঁড়াও, ওকে এখুনি মেরে ফেলছি।

রাক্ষস ॥ তোকে চিবিয়ে খাব — চিবিয়ে খাব—

খোকা ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—

(যুদ্ধের শব্দ)

খোকা ॥ ঐ দ্যাখো ভোমরা-বাহন, রাক্ষসের মুণ্ডু কেটে ফেলেছি — ঐ সমুদ্রের জলে তার রক্তমাখা ধড়টা ডুবে গেল।

ভোমরা ॥ কিন্তু অন্য রাক্ষসটা যে আসছে।

খোকা ॥ কই ?

ভোমরা ॥ ঐ যে একটা কালো মেঘ ছুটে আসছে — ওটা রাক্ষস। বৃষ্টির তীর দিয়ে তোমায় বিঁধবে, বিদ্যুতের বজ্র দিয়ে তোমাকে পুড়িয়ে দেবে। এখনো যদি চাও তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

খোকা ॥ না, কখ্খনো ফিরে যাব না। আমি মেঘ-রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

(যুদ্ধ)

ভোমরা-বাহন, হঠাৎ মেঘ-রাক্ষস কোথায় মিলিয়ে গেল!

ভোমরা ॥ তোমার সাহস দেখে সে পালিয়ে গেছে — আর আসবে না। ঐ সামনে পরী-রাজ্যের সোনার সিংদরজা।

খোকা ॥ চলো চলো, শীগ্গির চলো, আর দেরি কোরো না।— কী সুন্দর পরীরা নেচে নেচে গান করছে—

(পরীদের নৃত্যগীত)

এস নতুন মানুষ পরী-ভূমে
তোমায় আপন করে নেব চুমে চুমে।
নয়নে ফুটাব দীপ্তি
বুক ভরে দেব তৃপ্তি
তুমি খেলার সাথী হবে জাগর-ঘুমে।

খোকা ॥ তোমাদের নাম কী ?

পরী ॥ আমার নাম হাসি-পরী। তুমি আমার সঙ্গে খেলা করবে ?

খোকা ॥ হ্যাঁ।

পরী ॥ আমার নাম খেলা-পরী। তুমি আমার সঙ্গে খেলা করবে ?

খোকা ॥ হ্যাঁ, কিন্তু আশা-পরী কই ?

পরী ॥ এই যে আমি। খোকা, আমায় চিনতে পারছ না ?

খোকা ॥ তুমি কেন আশা-পরী হতে যাবে ? আশা-পরীর তো অন্যরকম চেহারা।

পরী ॥ আমিই আশা-পরী সেজে তোমার কাছে গিয়েছিলুম — এখন আমি তৃপ্তি-পরী। তুমি রাক্ষসদের মেরে এ-রাজ্যের রাজা হয়েছ। আমরা তোমার প্রজা, সখী — খেলার সাথী। চলো, সমুদ্রের ধারে ঝিনুক প্রবাল আর মুক্তো নিয়ে খেলা করিগে।

খোকা ॥ চলো—

(পরীদের-নৃত্যগীত)

এসো নতুন মানুষ

অনুশীলনী

১। পরী কথাটার বানান শিখতে শিখতে খোকার কী দেখে মন নেচে উঠল ?

২। পরীর যে গানটি খোকা প্রথম শুনতে পেলো সেটি মুখস্থ বলো।

৩। ভোমরা-বাহন খোকাকে পিঠে নেবার কী সর্ত করল ?

৪। রাক্ষস যখন খোকাকে চিবিয়ে খাবে বলল তখন খোকা হা হা ক'রে হেসে উঠে কী কাণ্ড বাধাল ?

৫। আশা-পরী, তৃপ্তি-পরী হয়ে খোকাকে তাদের রাজত্বের রাজা বানিয়ে হাসি-পরী, খেলা-পরী আর অন্য পরীদের নিয়ে কোন্ গান গেয়ে নৃত্যগীত করল ?

৬। মিল দাও :

দেশ ————————। ভূমে ————————।

খেলা ————————। দীপ্তি ————————।

৭। বাক্য তৈরি করো :

সিংদরজা, বিচ্ছিরি, রক্ত মাখা, বজ্র, বিদ্যুৎ।

নিজে পড়ি

পঞ্চম পাঠ

এই পঞ্চম পাঠ 'নিজে পড়ি' পঞ্চম শ্রেণীর উপযোগী বাংলা পাঠ্য বই (reader)। এই বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে এরই পরিপূরক 'নিজে লিখি নিজে পড়ি' পঞ্চম ভাগ বইটি প্রকাশিত হয়েছে, যেটি অনুশীলনী বা সহায়ক পুস্তক (workbook)। বই দু'খানি এমনভাবে লেখা হয়েছে যাতে গোড়া থেকেই ছেলেমেয়েরা সহজে বাংলাভাষা চর্চা করতে শেখে—বিভিন্ন ধরণের গল্প, কবিতা, ও প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে তারা এই ভাষা আয়ত্ত করতে উৎসাহ পায়।

এই পুস্তকমালার লেখিকা একজন অভিজ্ঞ শিক্ষিকা এবং তিনি এই স্তরের আরো অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার অভিজ্ঞতা মিলিয়ে এর পরিকল্পনা করেছেন। তার ফলে এই পুস্তকগুলি বাংলা শেখার অন্যতম প্রধান ও সর্বাধুনিক পুস্তকমালা হয়ে উঠেছে।

প্রথম শ্রেণীর আগের স্তরে, অর্থাৎ প্রস্তুতি শ্রেণীর (Preparatory) জন্য কেবল 'নিজে লিখি নিজে পড়ি' [প্রাথমিকা]-সহ এই পুস্তকমালায় প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি শ্রেণীর জন্য দু-খানি করে (পাঠ্য ও অনুশীলনী) পুস্তক পরিকল্পিত হয়েছে। আকার ও আয়তন পৃথক হলেও প্রতিটি পুস্তক পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য ধারাবাহিক ও ক্রমাগ্রসর (graded) পদ্ধতিতে ও নিয়ন্ত্রিত শব্দসমষ্টি (controlled vocabulary) বজায় রেখে এগুলি রচিত হয়েছে।

বাংলা যাদের দ্বিতীয় ভাষা এবং বাংলা যাদের প্রথম বা মাতৃভাষা—উভয় শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই মাধ্যমিক স্তরে বাংলাভাষা শিক্ষায় একই যোগসূত্রে মিলতে পারবে এই পুস্তকমালায়।

Bandyopadhya, Gita : NIJE PARI [Bengali, I
ISBN 0 86131 717 3